বলিতেন, আমার এই ব্যাপারে লজ্জা হয় যে, মৃত্যুর পর আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিব অথচ তাঁহার ঘরে পায়ে হাঁটিয়া যাই নাই।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পরহেযগার ছিলেন। মুসনাদে আহমদ কিতাবে তাঁহার নিকট হইতে একাধিক রেওয়ায়াত নকল করা হইয়াছে। তালকীহ নামক কিতাবের গ্রন্থকার তাঁহাকে ঐ সমস্ত সাহাবীর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন যাহাদের নিকট হইতে তেরটি হাদীস নকল করা হইয়াছে। সাত বৎসর বয়সই বা কি, ঐ বয়সে এতগুলি হাদীস মুখস্থ রাখা এবং বর্ণনা করা প্রখর স্মরণশক্তি এবং চরম আগ্রহের প্রমাণ। আফাসোসের বিষয় যে, আমরা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আপন সন্তানদেরকে দ্বীনের সাধারণ বিষয়ও শিক্ষা দেই না।

(২০) হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর শৈশবকালে এলেমের প্রতি অনুরাগ

সাইয়্যেদ হযরত হুসাইন (রাযিঃ) আপন ভাই হযরত হাসান (রাযিঃ) হইতে এক বৎসরের ছোট ছিলেন। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স আরো কম ছিল, অর্থাৎ ছয় বৎসর কয়েক মাস। ছয় বৎসর বয়সের বাচ্চা দ্বীনি কথা কতটুকুই বা স্মরণ রাখিতে পারে কিন্তু হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতসমূহও হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মুহাদ্দিসগণ তাঁহাকে ঐ সমস্ত সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাহাদের নিকট হইতে আটটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমান পুরুষ হউক বা মহিলা যদি কোন মুসীবতে আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘদিন পর ঐ মুসীবতের কথা স্মরণ হয় আর সে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তবে তাহাকে তখনও ঐ পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে যেই পরিমাণ মুসীবতের সময় দেওয়া হইয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার উম্মত যখন নদীপথে কোন যানবাহনে সওয়ার হয় এবং সওয়ার হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করে—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে ইহা ডুবিয়া যাওয়া হইতে নিরাপত্তার কারণ হইবে।

হযরত হুসাইন (রাযিঃ) পায়ে হাঁটিয়া পঁচিশ বার হজ্জ করিয়াছেন। নামায, রোযা অধিক পরিমাণে আদায় করিতেন। সদকা-খাইরাত ও দ্বীনের অন্যান্য আমল অধিকহারে করার প্রতি যত্নবান ছিলেন।

রবীয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত হুসাইন (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি একটি জানালার উপর উঠিলাম। সেখানে কিছু খেজুর রাখা ছিল। উহা হইতে আমি একটি খেজুর মুখে দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ফেলিয়া দাও, আমাদের জন্য সদকা জায়েয নয়।

হযরত হুসাইন (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও বর্ণিত আছে যে, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হইল অনর্থক কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া। (উসুদুল গাবাহ, ইস্তীআব)

ইহা ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীস তাঁহার মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে যে, তাঁহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সংঘটিত বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা মুখস্থ রাখিয়াছেন।

মাহমূদ ইবনে রবী (রাযিঃ) নামক জনৈক সাহাবী যাহার বয়স হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় পাঁচ বৎসর ছিল তিনি বলেন, আমি সারাজীবন এই কথা ভুলিব না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের এখানে একটি কূপ ছিল। উহার পানি দ্বারা আমার মুখে একটি কুলি নিক্ষেপ করিলেন। (ইসাবাহ)

আমরা বাচ্চাদেরকে আজেবাজে ও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত করি, মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী শুনাইয়া বেকার জিনিস দ্বারা তাহাদের দেমাগ অস্থির করিয়া ফেলি। যদি আল্লাহওয়ালাদের কিচ্ছা কাহিনী তালাশ করিয়া তাহাদেরকে শুনান হয়, জিন-ভূত ইত্যাদির ভয় না দেখাইয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাই এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির গুরুত্ব ও ভয় তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি করি, তবে ইহা দুনিয়াতেও তাহাদের কাজে আসিবে আর আখেরাতে তো উপকারী হইবেই। বাচ্চা বয়সে স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ থাকে, তাই ঐ সময়কার মুখস্থ করা বিষয় কোন সময় ভুলে না। এই সময় যদি কুরআন হিফজ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে কোন কষ্টও হয় না সময়ও ব্যয় হয় না। আমি আমার পিতার নিকটও একাধিকবার শুনিয়াছি, আর আমাদের ঘরের বৃদ্ধাদের কাছেও শুনিয়াছি যে, আমার পিতার যখন দুধ ছাড়ানো হয় তখনই তাঁহার পোয়া পারা কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আর সাত বৎসর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ করিয়া ফেলেন। তিনি তাঁহার পিতা অর্থাৎ আমার দাদাকে না জানাইয়া

কয়েকটি ফারসী কিতাব যেমন, বুস্তাঁ, সেকান্দারনামা প্রভৃতিও পড়িয়া নিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, হিফয শেষ হওয়ার পর আমার পিতা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, দৈনিক এক খতম তেলাওয়াত করিবার পর তোমার ছুটি। আমি গরমের মওসুমে ফজরের নামাযের পর ঘরের ছাদের উপর বসিতাম এবং ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে পূর্ণ এক খতম তেলাওয়াত করিয়া দুপুরের খানা খাইতাম এবং বিকালে নিজের ইচ্ছাতে ফারসী পড়িতাম। ছয় মাস পর্যন্ত অবিরাম এই নিয়মই চলিতে থাকে। অর্থাৎ দৈনিক এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সাথে সাথে অন্যান্য সবক পড়িতে থাকা। উহাও আবার সাত বৎসর বয়সে, ইহা কোন মামুলী কথা নহে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, কুরআন শরীফের কোন অংশ ভুলিয়া যাওয়া বা এক আয়াত পড়িতে যাইয়া অন্য আয়াতে চলিয়া যাওয়া এমন কখনও হইত না। যেহেতু বাহ্যিক জীবিকা কিতাবের ব্যবসার উপর ছিল এবং কুতুবখানার অধিকাংশ কাজকর্ম নিজ হাতেই করিতেন তাই এইরূপ কখনও হইত না যে, হাতে কাজ করার সময় মুখে কুরআন তেলাওয়াত করিতেছেন না। আবার কখনও কখনও একই সঙ্গে আমাদিগকে যাহারা মাদ্রাসা হইতে আলাদা সময় পড়িতাম সবকও পড়াইয়া দিতেন। এইভাবে একসাথে তিনটি কাজ করিতেন। তবে তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের সহিত ঐরূপ ছিল না যেরূপ মাদ্রাসায় সবক পড়ানো হইত। সাধারণ মাদ্রাসাসমূহের প্রচলিত নিয়ম হইল সব কাজই উস্তাদের জিম্মায় থাকে। বরং বিশেষ ছাত্রদের ক্ষেত্রে তাহার নিয়ম এই ছিলে যে, ছাত্র কিতাব পড়িবে, তরজমা করিবে মতলব বয়ান করিবে। অর্থ সঠিক হইলে বলিতেন সামনে চল, আর যদি ভুল হইত তবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার মত হইলে সতর্ক করিয়া দিতেন আর বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইলে বলিয়া দিতেন। ইহা পুরাতন যুগের ঘটনা নহে ; এই শতাব্দীরই ঘটনা। অতএব এই কথা বলা যাইবে না যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ন্যায় শক্তি ও হিম্মত এখন কোথায় পাওয়া যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)এর প্রতি ভালবাসার নমুনা

যদিও এই পর্যন্ত যত ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে সবগুলি মহব্বতেরই আশ্চর্য দৃষ্টান্ত ছিল। মহব্বতই তাঁহাদের আবেগপূর্ণ জীবনের উৎস ছিল যাহার দরুন না জানের পরোয়া ছিল, না জীবনের আকাঙ্খা, না মালের

খেয়াল ছিল, না দুঃখ কষ্টের চিন্তা, না মৃত্যুর ভয়। ইহা ছাড়া মহব্বত ও ভালবাসা বর্ণনা করিবার বিষয় নহে। উহা এমন একটি অবস্থা যাহা ভাষা ও বর্ণনার বহু ঊর্ধ্বে। মহব্বতই এমন এক জিনিস যাহা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার পর মাহবূব অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেয়। উহার মোকাবিলায় লজ্জা শরম, মান মর্যাদা কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। আল্লাহ তায়ালা যদি স্বীয় অনুগ্রহে এবং আপন মাহবূবের অসীলায় তাঁহার এবং তাঁহার পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মহব্বত ও ভালবাসা দান করেন, তবে প্রত্যেক এবাদতে স্বাদ পাওয়া যাইবে এবং দ্বীনের জন্য সকল কষ্টই আরাম মনে হইবে।

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ইসলামের ঘোষণা ও নির্যাতন ভোগ

ইসলামের প্রথম যুগে যাঁহারা মুসলমান হইতেন তাঁহারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে যথাসাধ্য গোপন রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতেও কাফেরদের নির্যাতনের কারণে গোপন রাখার উপদেশ দেওয়া হইত। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ঊনচল্লিশে পৌঁছিয়া যায় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আবেদন জানাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বার বার অনুরোধের কারণে অবশেষে অনুমতি দিলেন এবং মুসলমানদিগকে লইয়া কাবাঘরে তাশরীফ লইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাবলীগি খুতবা পাঠ শুরু করিলেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম খুতবা। ঐ দিনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা (অর্থাৎ শহীদগণের সরদার) হযরত হামযা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার তিনদিন পর হযরত ওমর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। খুতবা শুরু হইতেই কাফের- মুশরেকরা চতুর্দিক হইতে আসিয়া মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যাহার সম্মান ও মর্যাদা মক্কার সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে, তাঁহার সম্পূর্ণ চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গেল। নাক কান রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাঁহাকে চেনা যাইতেছিল না। জুতা ও লাথি দ্বারা আঘাত করিল, পদদলন করিল। যাহা করা উচিত ছিল না সবই করিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বেহুঁশ হইয়া

গেলেন। তাঁহার গোত্র বনি তামীমের লোকেরা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। কাহারো এই ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না যে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এই পাশবিক অত্যাচার হইতে জীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারিবেন না। বনু তামীম মসজিদে আসিল এবং ঘোষণা করিল যে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যদি এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন তবে আমরা তাঁহার বদলায় উতবা ইবনে রবীয়াকে হত্যা করিব। উতবা হযরত ছিদ্দীকে আবকর (রাযিঃ)কে নির্যাতন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। ডাকাডাকি সত্ত্বেও সাড়া দিতে বা কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। সন্ধ্যায় অনেক ডাকাডাকির পর তিনি কথা বলিলেন। তবে সর্বপ্রথম কথা এই ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা এই ব্যাপারে তাঁহাকে বহু তিরস্কার করিল যে, তাহার সঙ্গে চলার কারণেই তো তোমার উপর এই বিপদ আসিয়াছে এবং সারাদিন মৃত্যুমুখে থাকিবার পর কথা বলিলে তো তাহাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই জযবা এবং তাঁহারই আকাঙ্খা! অতঃপর লোকজন তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কেননা বিরক্তিও ছিল আর ইহাও ছিল যে, শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন যেহেতু কথা বলিতে পারিয়াছেন। তাহারা হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে খাইরকে বলিয়া গেল যে, তাহার জন্য কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করুন। তিনি কিছু তৈরী করিয়া আনিলেন এবং খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর সেই একই কথা ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন, তাঁহার কি অবস্থা? তাহার মাতা বলিলেন, তিনি কেমন আছেন তাহা তো আমি জানি না। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, উম্মে জামীল (হযরত উমর (রাযিঃ)এর বোন)এর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাঁহার কি অবস্থা। সে বেচারী তাঁহার পুত্রের নির্যাতিত অবস্থায় ব্যাকুল মনের আবেদন পুরা করিবার জন্য উম্মে জামীলের নিকট গিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তখন পর্যন্ত নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কি জানি কে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর কে আবু বকর (রাযিঃ)? তবে তোমার ছেলের কথা শুনিয়া দুঃখ হইয়াছে। যদি তুমি বল তবে আমি যাইয়া তাহার অবস্থা দেখিতে পারি। উম্মে খাইর ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত গেলেন এবং হযরত আবু বকর

(রাযিঃ)এর অবস্থা দেখিয়া সহ্য করিতে পরিলেন না। বেদমভাবে কাঁদিতে শুরু করিলেন যে, পাপিষ্ঠরা কি অবস্থা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করুন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? উম্মে জামীল (রাযিঃ) হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর মাতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাঁহার ব্যাপারে ভয় করিও না। তখন উম্মে জামীল (রাযিঃ) ভাল খবর শুনাইলেন এবং বলিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? উম্মে জামীল (রাযিঃ) বলিলেন, আরকাম (রাযিঃ)এর ঘরে অবস্থান করিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জন্য খোদার কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন জিনিস খাইব, না পান করিব যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ না করিব। তাঁহার মায়ের অস্থিরতা ছিল যে, সে কিছু আহার করুক আর তিনি কসম খাইলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎ না করিব কিছুই খাইব না। কাজেই মাতা সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন যে, লোকদের চলাচল বন্ধ হইয়া যাক কারণ আবার কেহ দেখিয়া ফেলিলে কষ্ট দিতে পারে। যখন রাত্র গভীর হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে লইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরকাম (রাযিঃ)এর বাড়ীতে পৌঁছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়াইয়া ধরিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন এবং সমস্ত মুসলমানগণও কাঁদিতে লাগিলেন। কেননা, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর অবস্থা দেখিয়া সহ্য করার মত ছিল না। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আবেদন করিলেন যে, ইনি আমার মাতা আপনি তাহার জন্য হেদায়েতের দোয়াও করুন এবং তাহাকে ইসলামের তাবলীগও করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দোয়া করিলেন অতঃপর তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ সুখ-শান্তি ও আনন্দের সময় মহব্বতের দাবীদার অসংখ্য পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত মহব্বত উহাই যাহা বিপদ ও কষ্টের সময়ও অটুট থাকে।

② হুযূর (সঃ)এর ইন্তিকালে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর শোকাবেগ

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর অতুলনীয় শক্তি, সাহস বীরত্ব ও বাহাদুরী যাহা আজ সাড়ে তের শত বৎসর পরও বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। আর ইসলামের প্রকাশ তাহার ইসলাম গ্রহণের কারণেই হইয়াছে। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখা বরদাশত করেন নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার মহব্বতের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এই যে, এত বাহাদুরী সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের অবস্থা সহ্য করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় খোলা তরবারি হাতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে, তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন রবের নিকট তাশরীফ লইয়া গিয়াছেন যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে তাশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিবেন। এবং ঐ সমস্ত লোকদের হাত-পা কাটিয়া দিবেন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মিথ্যা খবর রটাইতেছে। হযরত ওসমান (রাযিঃ) একেবারে নির্বাক ছিলেন, দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। চলাফেরা করিতেন কিন্তু কোন কথা বলিতেন না। হযরত আলী (রাযিঃ)ও নীরব ও নির্বাক বসিয়া রহিলেন। দেহে যেন স্পন্দনও ছিল না। একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মধ্যেই দৃঢ়তা ছিল। তিনি সেই সময়ের পাহাড় সমতুল্য সমস্যার মোকাবিলা করিলেন এবং নিজের সেই মহব্বত সত্ত্বেও যাহা পূর্ববর্তী ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে আসিয়া প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মোবারকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, বসিয়া যাও। তার পর খুতবা পাঠ করিলেন, যাহার সারমর্ম এই ছিল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে সে যেন জানিয়া রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা জীবিত আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতঃপর তিনি কালামে পাকের এই আয়াত وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন (খামীস)।

"মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র (তিনি তো খোদা নহেন যে তাহার মৃত্যু আসিতে পারে না।) তাহার যদি ইন্তিকাল হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদও হইয়া যান তবে তোমরা কি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করিবে না (নিজেরই ক্ষতি করিবে) আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে প্রতিদান দিবেন।" (বয়ানুল কুরআন)

ফায়দা ঃ যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর দ্বারা খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লইবেন তাই সেই সময় এই অবস্থাটিই তাঁহার উপযোগী ছিল। এই কারণেই সেই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মধ্যে যতটুকু ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল তাহা আর কাহারো মধ্যে ছিল না। সেই সঙ্গে মীরাছ অর্থাৎ উত্তরাধিকার, দাফন ইত্যাদি বিষয়ে ঐ সময়ের উপযোগী মাসায়েল যে পরিমাণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)এর জানা ছিল সামগ্রিকভাবে আর কাহারো জানা ছিল না। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল যে, মক্কা মুকাররমায় দাফন করা হইবে নাকি মদীনা মুনাওয়ারায়, নাকি বাইতুল মোকাদ্দাসে তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, নবীর কবর ঐ জায়গায়ই হয় যেখানে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। অতএব যেখানে তাঁহার ইন্তিকাল হইয়াছে সেখানেই কবর খনন করা হউক। তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, আমাদের (নবীগণের) কোন ওয়ারিছ হয় না। আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাই তাহা সদকা স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর সে বেপরওয়াভাবে অবহেলা করিয়া অন্য কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করে, তাহার উপর লা'নত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, কোরাইশগণ এই বিষয়ের অর্থাৎ হুকুমতের জিম্মাদার হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

③ হুযূর (সঃ)এর সংবাদ জানার জন্য এক মহিলার অস্থিরতা

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক কষ্টও ভোগ করিয়াছেন এবং অনেক লোক শহীদও হইয়াছেন। এই মর্মান্তিক খবর মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছিলে মহিলাগণ খবরা-খবর জানার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘর হইতে

বাহির হইয়া পড়েন। এক আনসারী মহিলা একটি দলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? দলের মধ্য হইতে কেহ বলিল, তোমার পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং ব্যাকুল হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতিমধ্যেই কেহ তাহার স্বামীর কেহ তাহার ছেলের কেহ তাহার ভাইয়ের ইন্তেকালের কথা শুনাইল, ইহারা সকলেই শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল আছেন এবং আসিতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে বলুন তিনি কোথায় আছেন। লোকেরা ইশারা করিয়া বলিল, ঐ দলের মধ্যে আছেন। তিনি দৌড়াইয়া গেলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভে চক্ষু শীতল করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর সমস্ত মুসীবত হালকা ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এক বর্ণনায় আছে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় ধরিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউক, আপনি যখন জীবিত ও সুস্থ আছেন তখন আর কাহারো মৃত্যুর পরোয়া নাই। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা ঐ সময়ে ঘটিয়াছে। তাই ঐতিহাসিকদের মধ্যে নামের ব্যাপারে মতভেদও রহিয়াছে। তবে সঠিক হইল, এই ধরনের ঘটনা একাধিক মহিলার সহিত ঘটিয়াছে।

(৪) হুদাইবিয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত মুগীরা (রাযিঃ)এর আচরণ এবং সাধারণ সাহাবীগণের কর্মধারা

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর এক বিরাট জামাত সহ রওয়ানা হইয়াছিলেন। মক্কার কাফেরদের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে হইবে। এই জন্য তাহারা বিরাট আকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিল এবং মক্কার বাহিরের লোকদিগকেও তাহাদের সহিত শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিল এবং বিরাট দল লইয়া মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। যুল হুলাইফা নামক স্থান হইতে এক

ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর লওয়ার জন্য পাঠাইলেন যিনি মক্কা হইতে বিস্তারিত অবস্থা জানিয়া উসফান নামক স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলিলেন যে, মক্কাবাসীরা বিরাট আকারে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য বাহির হইতেও বহু লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। এক পন্থা এই হইতে পারে যে, সমস্ত লোক বাহির হইতে সাহায্য করার জন্য গিয়াছে তাহাদের ঘর বাড়ীর উপর হামলা করা, যখন তাহারা এই সংবাদ পাইবে মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবে। অন্য পন্থা হইল সোজা সামনের দিকে চলা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুহূর্তে আপনি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য তো ছিলই না। তাই সামনের দিকে অগ্রসর হউন। তাহারা যদি আমাদিগকে বাধা দেয় তবে মোকাবিলা করিব নতুবা নহে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় পৌছিলে বুদাইল ইবনে ওরকা খুযায়ী একদল লোকসহ আসিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাইল যে, কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল উমরা করা। তাছাড়া দৈনন্দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ কোরাইশদেরকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহারা সম্মত হইলে আমি তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে চুক্তি হইয়া যাক যে, তাহারা আমার পিছনে পড়িবে না আমিও তাহাদের পিছনে পড়িব না এবং আমাকে অন্যদের সহিত বুঝাপড়া করিবার সুযোগ দিক। আর যদি তাহারা কিছুতেই রাজী না হয় তবে ঐ জাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী না হইবে অথবা আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হইবে। বুদাইল বলিল, আচ্ছা, আমি আপনার পয়গাম তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিতেছি। সে ফিরিয়া গেল এবং যাইয়া পয়গাম পৌছাইল। কিন্তু কাফেররা রাজী হইল না। এমনিভাবে উভয় পক্ষ হইতে আসা যাওয়া চলিতে থাকিল। তন্মধ্যে একবার ওরোয়া ইবনে

মাসউদ সাকাফী কাফেরদের পক্ষ হইতে আসিলেন। তখনও তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন না, পরে মুসলমান হইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিতও একই আলোচনা করিলেন যাহা বুদাইলের সহিত করিয়াছিলেন। ওরোয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যদি আরবদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান তবে ইহা সম্ভব নহে। আপনি কি কখনও শুনিয়াছেন যে, আপনার পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি অতীত হইয়াছে, যে কিনা আরবদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে? আর যদি বিপরীত অবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারা আপনার উপর বিজয়ী হয় তবে মনে রাখুন, আমি আপনার সহিত ভদ্র শ্রেণীর লোকজন দেখিতেছি না, এদিক সেদিকের নিম্নশ্রেণীর লোকজন আপনার সহিত রহিয়াছে। বিপদের সময় সকলেই পালাইয়া যাইবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তুই তোর মাবুদ লাত-এর লজ্জাস্থান চাট। আমরা কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে পালাইয়া যাইব? এবং তাহাকে একা ছাড়িয়া দিব? ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার একটি অতীত অনুগ্রহ আমার উপর রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে দিতে পারি নাই যদি ইহা না হইত নতুবা এই গালির জবাব দিতাম। এই বলিয়া ওরোয়া পুনরায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তায় মশগুল হইয়া গেলেন এবং আরবদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কথাবার্তার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকের দিকে হাত বাড়াইতেন। কেননা খোশামোদ কারর সময় দাড়িতে হাত লাগাইয়া কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সাহাবা (রাযিঃ) ইহা কিভাবে সহ্য করিতে পারেন। ওরোয়ার ভাতিজা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিয়া অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তরবারীর বাট দ্বারা ওরোয়ার হাতে আঘাত করিয়া বলিলেন, হাত দূরে রাখ। ওরোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুগীরা। ওরোয়া বলিলেন, হে গাদ্দার! তোর গাদ্দারীর ফল আমি এখন পর্যন্ত ভুগিতেছি আর তোর এই ব্যবহার। (হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কয়েকজন কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন। উহার রক্তপণ

ওরোয়া আদায় করিয়াছিল। তিনি ঐদিকে ইঙ্গিত করিলেন। মোটকথা, তিনি দীর্ঘক্ষণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের অবস্থা পর্যবেক্ষণও করিয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর ফিরিয়া গিয়া কাফেরদের নিকট বলিলেন, হে কুরাইশ! আমি বড় বড় রাজা বাদশাহদের দরবারে গিয়াছি, কিসরা, কাইসার ও নাজাশীর দরবারও দেখিয়াছি এবং তাহাদের রীতি-নীতিও দেখিয়াছি, খোদার কসম! আমি কোন বাদশাহকে দেখি নাই যে, তাহার লোকেরা তাহার এইরূপ সম্মান করে যেরূপ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) লোকেরা তাহার সম্মান করে। যদি তিনি থু থু ফেলেন তবে যাহার হাতে পড়িয়া যায়, সে উহাকে শরীরে ও মুখে মাখিয়া লয়। যে কথা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুখ হইতে বাহির হয় উহা পালন করিবার জন্য সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাঁহার অযুর পানি পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া বন্টন করিয়া লয়, মাটিতে পড়িতে দেয় না। যদি কেহ পানির ফোটা না পায় তবে অন্যের ভিজা হাতে হাত মলিয়া নিজের মুখে মাখিয়া লয়। তাঁহার সামনে অত্যন্ত নিচু আওয়াজে কথা বলে, উচ্চ আওয়াজে কথা বলে না। আদবের কারণে তাঁহার দিকে চক্ষু উঠাইয়া দেখে না। যদি তাহার কোন দাড়ি বা চুল ঝরিয়া পড়ে তবে বরকতের জন্য উহা উঠাইয়া লয় এবং উহার সম্মান করে। মোটকথা আমি কোন দলকেই আপন মনিবের সহিত এত মহব্বত করিতে দেখি নাই, যত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর লোকজন তাঁহার সহিত করিয়া থাকে। এই অবস্থা চলাকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান (রাযিঃ)কে নিজের পক্ষ হইতে দূত হিসাবে মক্কার সরদারদের নিকট পাঠাইলেন। হযরত উছমান (রাযিঃ) মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহার ব্যাপারে তেমন আশংকা ছিল না। এই কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্বাচন করিয়াছিলেন। তিনি মক্কায় গেলেন। সাহাবীদের ঈর্ষা হইল যে, উছমান (রাযিঃ) তো আনন্দের সহিত কাবাঘর তাওয়াফ করিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আশা করি না যে, সে আমাকে ছাড়া তাওয়াফ করিবে। সুতরাং হযরত উছমান (রাযিঃ) যখন মক্কায় পৌঁছিলেন তখন আবান ইবনে সাঈদ তাঁহাকে নিরাপত্তা দিল এবং তাহাকে বলিল যে, যেখানে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার কেহ তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না। হযরত উছমান (রাযিঃ) আবু সুফিয়ান ও মক্কার

অন্যান্য সরদারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছাইতে থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন তখন কাফিররা নিজেরাই অনুরোধ করিল যে, তুমি মক্কা আসিয়াছ সুতরাং তাওয়াফ করিয়া যাও। তিনি জওয়াব দিলেন যে, ইহা আমার দ্বারা সম্ভব নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো বাধা দেওয়া হইয়াছে আর আমি তাওয়াফ করিব। কুরাইশরা এই উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত উছমান (রাযিঃ)কে আটক করিয়া রাখিল। মুসলমানদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, তাহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট হইতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করিয়া যাওয়ার বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। কাফেররা এই সংবাদ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেল এবং হযরত উছমান (রাযিঃ)কে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিল। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ঘটনায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর উক্তি, হযরত মুগীরা (রাযিঃ) কর্তৃক আঘাত করা, সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ যাহা ওরোয়া গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, হযরত উছমান (রাযিঃ)এর তাওয়াফ করিতে অস্বীকার করা—প্রত্যেকটি বিষয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অকৃত্রিম ও পরম ভালবাসার পরিচয় দেয়। উল্লেখিত ঘটনায় যে বায়াতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহাকে 'বায়াতুশ-শাজারা' বলা হয়। কুরআনে পাকেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ফাত্হের لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الاٰية আয়াতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ণ আয়াত তরজমাসহ পরিশিষ্টে আসিবে।

(৫) হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর রক্তপান

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শিংগা লাগাইলেন। উহার ফলে যে রক্ত বাহির হইল উহা কোথাও মাটির নীচে চাপা দেওয়ার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)কে দিলেন। তিনি গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চাপা দিয়া আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? তিনি বলিলেন, আমি পান করিয়া ফেলিয়াছি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাহার শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করিবে জাহান্নামের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার জন্যও মানুষের দ্বারা ধ্বংস রহিয়াছে আর

মানুষের জন্য তোমার দ্বারা। (খামীস)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহনির্গত জিনিস পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি পাক। এইজন্য ইহাতে কোন আপত্তি নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলিয়াছেন, 'ধ্বংস রহিয়াছে' ইহার অর্থ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, বাদশাহী ও হুকুমতের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ হুকুমত হইবে এবং লোকেরা উহাতে বাধা প্রদান করিবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)-এর জন্মের সময়ও এইরূপ একটি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নেকড়ে বাঘের দলের মধ্যে একটি দুম্বা। আর সেই নেকড়ে বাঘগুলি কাপড় পরিহিত হইবে। পরিশেষে ইয়াযীদ ও আবদুল মালিকের সহিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর বিখ্যাত যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন।

(৬) হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাযিঃ)এর রক্তপান

উহুদের যুদ্ধে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অথবা মাথা মুবারকে লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) দ্রুত আগাইয়া আসিলেন এবং অপরদিক হইতে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং আগে বাড়িয়া লোহার উক্ত কড়া দাঁত দ্বারা টানিতে আরম্ভ করিলেন। একটি কড়া বাহির করিলেন যদ্দরুন হযরত আবু ওবায়দা (রাযিঃ)এর একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উহার পরোয়া করিলেন না। অপর কড়াটি টান দিলেন আরেকটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সেই কড়াটি বাহির করিয়াই আনিলেন। ঐ কড়াগুলি বাহির হওয়ার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)এর পিতা মালেক ইবনে সিনান (রাযিঃ) নিজের ঠোঁটের সাহায্যে ঐ রক্ত চুষিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাহার রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিতে পারিবে না। (কুররাতুল উয়ূন)

(৭) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ)এর আপন পিতাকে অস্বীকার করা

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ) জাহিলিয়াতের যুগে তাহার

মাতার সহিত নানার বাড়ীতে যাইতেছিলেন। বনু কাইসের লোকেরা কাফেলাকে লুণ্ঠন করিল। তন্মধ্যে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)ও ছিলেন, তাহাকে মক্কার বাজারে বিক্রয় করিয়া দিল। হাকীম ইবনে হিযাম তাঁহাকে আপন ফুফী হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর জন্য খরিদ করিয়া নিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইল তখন তিনি হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা পুত্রের বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। আর এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা সন্তানের মহব্বত জন্মগত জিনিস। তিনি হযরত যায়েদের বিচ্ছেদে কাঁদিতেন আর শোকের কবিতা পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অধিকাংশ সময় যে সমস্ত কবিতা পাঠ করিতেন সেইগুলির মোটামুটি অর্থ এই—

'আমি যায়েদের স্মরণে কাঁদিতেছি, আর ইহাও জানিনা যে, সে কি জীবিত আছে, তবে তাহার আশা করিতাম। নাকি মৃত্যু তাহাকে শেষ করিয়া দিয়াছে। খোদার কসম, আমি ইহাও জানি না, হে যায়েদ! তোমাকে কোন নরম জমিন ধ্বংস করিয়াছে নাকি কোন পাহাড় ধ্বংস করিয়াছে? হায়! যদি জানিতে পারিতাম যে, জীবনে কোন দিন তুমি ফিরিয়া আসিবে কিনা! সারা দুনিয়াতে আমার একমাত্র আকাঙ্খা তোমার ফিরিয়া আসা। যখন সূর্যোদয় হয় তখনও যায়েদ স্মরণে আসে। যখন বৃষ্টি বর্ষণের সময় হয় তখনও তাহারই স্মরণ আমাকে ব্যথিত করে। যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তখন উহাও তাহার স্মৃতিকে জাগরিত করে। হায়! আমার চিন্তা ও দুঃখ কতই না দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার তালাশ এবং চেষ্টায় সারা পৃথিবীতে উটের দ্রুতগতিকে ব্যবহার করিব এবং সমগ্র দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব ক্লান্ত হইব না। উট চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যায় তো যাইবে কিন্তু আমি কখনও ক্লান্ত হইব না। আমি সারাজীবন এইভাবে শেষ করিয়া দিব। হাঁ, যদি আমার মৃত্যুই আসিয়া যায় তবে তো ভাল। কেননা মৃত্যু সবকিছুকেই ধ্বংস করিয়া দেয়। মানুষ চাই যত আশাই করুক কিন্তু আমি আমার পরে অমুক অমুক আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদিগকে অসিয়ত করিয়া যাইব যেন তাহারাও এমনিভাবে যায়েদকে তালাশ করিয়া ফিরে।'

মোটকথা তিনি এই সমস্ত কবিতা পড়িতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার গোত্রের কিছুলোক হজ্জে গেল এবং তাহারা যায়েদ (রাযিঃ)কে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল। তাঁহাকে

পিতার অবস্থা শুনাইল কবিতা শুনাইল এবং তাহার স্মরণ ও বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী শুনাইল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তাহাদের মাধ্যমে পিতার নিকট তিনটি কবিতা বলিয়া পাঠাইলেন যাহার অর্থ এই ছিল—

"আমি এখানে মক্কায় আছি ভাল আছি। আপনারা আমার জন্য কোন দুঃখ ও চিন্তা করিবেন না। আমি অত্যন্ত দয়ালু লোকদের গোলামীতে আছি।"

তাহারা যাইয়া হযরত যায়েদের হাল অবস্থা তাহার পিতাকে জানাইল এবং যায়েদ (রাযিঃ) যে কবিতাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেইগুলিও শুনাইল এবং ঠিকানা বলিয়া দিল। যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা ও চাচা কিছু মুক্তিপণ লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন এবং আরজ করিলেন, হে হাশেমের বংশধর! এবং আপন গোত্রের সরদার, হরম শরীফের অধিবাসী এবং আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা স্বয়ং কয়েদীদেরকে মুক্ত করেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন। আমরা আমাদের ছেলের তালাশে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, দয়া করুন এবং মুক্তিপণ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিন। বরং মুক্তিপণ যাহা আসে উহার চাইতেও বেশী গ্রহন করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি ব্যাপার? তাহারা বলিল, আমরা যায়েদের খোঁজে আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুধু এই ব্যাপার! তাহারা আরজ করিলেন, হুযূর, শুধু ইহাই উদ্দেশ্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর যদি সে তোমাদের সহিত যাইতে চায় তবে মুক্তিপণ ছাড়াই তাহাকে দান করিলাম। আর যদি যাইতে না চায়, তবে আমি এমন ব্যক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারি না যে নিজেই যাইতে চাহে না। তাহারা বলিল, আপনি আমাদের দাবীর চেয়ে বেশী অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমরা ইহা খুশীতে মানিয়া লইলাম।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) কে ডাকা হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে চিন? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ, চিনি। ইনি আমার পিতা আর ইনি আমার চাচা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমার অবস্থা সম্পর্কে জান। এখন তোমার ইচ্ছা, যদি আমার কাছে থাকিতে চাও তবে আমার কাছে থাক, ইহাদের সহিত যাইতে চাহিলে অনুমতি আছে।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর! আমি কি আপনার

মোকাবিলায় অন্য কাহাকেও পছন্দ করিতে পারি? আপনি আমার পিতাতুল্য ও চাচাতুল্যও। পিতা ও চাচা বলিল, হে যায়েদ! তুমি আযাদীর তুলনায় গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতেছ আর বাপ, চাচা ও পরিবারের লোকদের চেয়ে গোলাম থাকাকেই পছন্দ করিতেছ? হযরত যায়েদ (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করিয়া) বলিলেন, আমি তাঁহার মধ্যে এমন বিষয় দেখিতে পাইয়াছি যাহার মোকাবিলায় অন্য কোন বস্তুকেই পছন্দ করিতে পারি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুনিয়া তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে আপন পুত্র বানাইয়া লইলাম। যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা এবং চাচাও এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং খুশিমনে তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। (খামীস)

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) ঐ সময় বাচ্চা ছিলেন। বাচ্চা অবস্থায় পিতামাতা পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া গোলাম থাকাকে পছন্দ করা কতখানি মহব্বতের পরিচয় দেয় তাহা পরিস্কার বুঝা যায়।

(৮) উহুদের যুদ্ধে হযরত আনাস ইবনে নজর (রাযিঃ)এর আমল

উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতেছিল তখন কেহ এই গুজব রটাইয়া দিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এই ভয়াবহ সংবাদের যেইরূপ প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের উপর পড়ার ছিল তাহা সুস্পষ্ট। এই কারণে মুসলমানরা আরো বেশী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হযরত আনাস ইবনে নজর (রাযিঃ) হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের মধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ) এবং হযরত তালহা (রাযিঃ)এর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে মুসলমানদেরকে চিন্তিত দেখা যাইতেছে কেন? তাহারা বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তোমরাই বা জীবিত থাকিয়া কি করিবে? তরবারী হাতে লও এবং যাইয়া মৃত্যুবরণ কর। সুতরাং হযরত আনাস (রাযিঃ) নিজে তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন যতক্ষণ শহীদ না হইলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য ছিল, যাহার দর্শন লাভের জন্য বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল, যখন তিনিই থাকিলেন না তখন আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? সুতরাং এই কথার উপরে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

(৯) উহুদ যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে রবী (রাযিঃ)এর পয়গাম

এই উহুদের যুদ্ধেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সা'দ ইবনে রবী এর অবস্থা জানা গেল না, তাহার কি হইল? অতঃপর এক সাহাবী (রাযিঃ)কে তাহার খোঁজে পাঠাইলেন। তিনি শহীদগণের মধ্যে তালাশ করিতেছিলেন এবং নাম ধরিয়া ডাকিতেও ছিলেন এই মনে করিয়া যে, হয়ত জীবিত আছেন। অতঃপর চিৎকার দিয়া বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠাইয়াছেন সাদ ইবনে রবী-এর খবর নেওয়ার জন্য। তখন এক জায়গা হইতে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ আসিল। তিনি ঐদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ) সাতজন শহীদের মধ্যে পড়িয়া আছেন এবং সামান্য নিঃশ্বাস বাকী আছে। যখন তিনি নিকটে পৌঁছিলেন তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সালাম আরজ করিবে আর বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে অতি উত্তম বদলা যাহা দান করিয়াছেন আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে উহার চাইতেও উত্তম বদলা দান করুন। আর মুসলমানদেরকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে যে, যদি কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি চক্ষুও দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে অর্থাৎ জীবিত থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। এই বলিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে এমন বিনিময় দান করুন যাহা কোন সাহাবীকে কোন নবীর উম্মতের পক্ষ হইতে দান করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই এই সকল জীবন উৎসর্গকারীগণ প্রাণ উৎসর্গের বাস্তব প্রমাণ দিয়াছেন (আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের কবর নূরে পরিপূর্ণ করিয়া দিন।) জখমের উপর জখম লাগিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে তথাপি কোন অভিযোগ কোন ভয়-ভীতি কোন পেরেশানীর অবকাশ নাই। কোন আকাংখা বা আগ্রহ থাকিলে তাহা শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জন্য জান কোরবান করার। হায়! আমার মত অধমেরও যদি ঐ মহব্বতের কিছু অংশ লাভ হইত!

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর দেখিয়া এক মেয়েলোকের মৃত্যু

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট একজন মেয়েলোক আসিয়া বলিল, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারক যিয়ারত করাইয়া দিন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুজরা শরীফ খুলিলেন। সে যিয়ারত করিল এবং যিয়ারত করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুবরণ করিল। (শিফা)

ফায়দা ঃ এমন এশ্‌ক ও মহব্বতের নজীর কি কোথাও মিলিবে? কবর যিয়ারত ও সহ্য করিতে পারিল না এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল।

(১১) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মহব্বতের বিভিন্ন ঘটনা

হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার মহব্বত কি পরিমাণ ছিল? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, খোদায়ে পাকের কসম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ হইতে, আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে, আমাদের মাতাগণ হইতে এবং কঠিন পিপাসার অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি হইতে অধিক প্রিয় ছিলেন।

ফায়দা ঃ সত্য বলিয়াছেন। বাস্তবে সাহাবায়ে কেরামদের এই অবস্থাই ছিল। আর হইবে না কেন? যখন তাঁহারা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ছিলেন, আর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

অর্থ—আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর ঐ ধনসম্পদ যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, আর ঐ ব্যবসা যাহার মধ্যে লোকসানের আশংকা কর আর ঐ ঘরবাড়ী যাহা তোমরা ভালবাস যদি (এইসব কিছু) তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং তাঁহার

রাসূল ও তাঁহার পথে জেহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য লোকদিগকে তাহাদের মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছান না। (বয়ানুল কুরআন)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত এই সমস্ত জিনিস হইতে কম হওয়ার ব্যাপারে ভয় দেখানো হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট আমার মহব্বত ও ভালবাসা তাহার পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ হইতে বেশী না হইবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, উপরোক্ত হাদীসে মহব্বত দ্বারা এখতিয়ারী মহব্বত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত মহব্বতকে বুঝানো হইয়াছে। গায়ের এখতেয়ারী অর্থাৎ স্বভাবসুলভ বা অনিচ্ছাকৃত মহব্বত এখানে উদ্দেশ্য নহে। ইহাও হইতে পারে যে, যদি স্বভাবসুলভ মহব্বত উদ্দেশ্য হয় তবে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ দর্জার ঈমান উদ্দেশ্য হইবে—যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মধ্যে ছিল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি বস্তু এমন যে ব্যক্তির মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে ঈমানের স্বাদ ও ঈমানের মজা তাহার নসীব হইয়া যাইবে। এক ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত অন্য সমস্ত জিনিস হইতে বেশী হইবে। দুই ঃ কাহাকেও ভালবাসিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসিবে। তিন ঃ কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার কাছে এমন কষ্টকর ও মুশকিল মনে হয় যেমন আগুনে পতিত হওয়া।

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার জান ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বেশী প্রিয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মুমেন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মহব্বত তাহার নিকট তাহার জানের চাইতেও বেশী না হইব। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমার নিকট আমার জানের চাইতেও বেশী প্রিয়। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন হে ওমর!

আলেমগণ এই কথার দুইটি অর্থ বলিয়াছেন। একটি হইল এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপরটি হইল সতর্ক করা হইয়াছে অর্থাৎ

এতক্ষণে তোমার মধ্যে এই জিনিস পয়দা হইয়াছে যে, আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, অথচ ইহা তো প্রথম হইতেই হওয়া উচিত ছিল।

সুহাইল তুস্তারী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের অভিভাবক মনে না করে এবং নিজের নফসকে নিজের মালিকানায় মনে করে সে সুন্নতের স্বাদ পাইতে পারে না।

এক সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন যে, কেয়ামত কখন আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ যে, উহার অপেক্ষা করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অধিক পরিমাণ নামায, রোযা ও সদকা তো তৈয়ার করিয়া রাখি নাই, তবে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের (সাঃ) মহব্বত আমার অন্তরে রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি তাহারই সহিত থাকিবে যাহার সহিত মহব্বত রাখিয়াছ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, "মানুষের হাশর তাহারই সহিত হইবে যাহার সহিত তাহার মহব্বত রহিয়াছে।" এই হাদীস কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ), সাফওয়ান (রাযিঃ), আবু যর (রাযিঃ) প্রমুখ রহিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এই এরশাদ শুনিয়া যত খুশি হইয়াছেন আর কোন কিছুতেই এত খুশী হন নাই। আর ইহা স্পষ্ট বিষয় যে, এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তো তাহাদের শিরা-উপশিরায় গাঁথা ছিল। সুতরাং তাহারা কেন খুশী হইবেন না।

হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘর প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটু দূরে ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার মনে চাহিতেছিল যে, তোমার ঘর যদি একেবারে নিকটে হইত। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, হারেছা (রাযিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে। তাহাকে বলিয়া দিন, সে যেন আমার ঘরের সহিত বিনিময় করিয়া লয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সহিত আগেও বিনিময় হইয়াছে এখন তো

লজ্জা হইতেছে। হারেছা (রাযিঃ) এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘর আপনার নিকটে হওয়া চাহিতেছেন। এইগুলি আমার ঘর। এইগুলি হইতে নিকটবর্তী আর কোন ঘর নাই। যেই ঘরটি পছন্দ হয় বিনিময় করিয়া নিন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এবং আমার মাল তো আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের জন্যই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! খোদার কসম আপনি যে মাল নিয়া নিবেন উহা আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ঐ মাল হইতে যাহা আমার কাছে থাকিয়া যাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন এবং ঘর বিনিময় করিয়া লইলেন। (তাবাকাত)

এক সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আপনার মহব্বত আমার নিকট আমার জানমাল এবং পরিবার-পরিজনের চাইতে বেশী। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়ে তখন সহ্য করিতে পারি না যেই পর্যন্ত আপনার খেদমতে হাজির হইয়া আপনার যিয়ারত না করিব। আমার চিন্তা হয় যে, মৃত্যু তো আপনারও আসিবে আমারও অবশ্যই আসিবে। ইহার পর আপনি নবীদের মর্তবায় চলিয়া যাইবেন। আমার ভয় হয় আর আপনাকে দেখিতে পাইব না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার উত্তরে চুপ থাকিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং এই আয়াত শুনাইলেন—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝
ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

অর্থ—যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করিবে তাহারাও জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকের সহিত থাকিবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ। আর ইহারা অতি উত্তম সঙ্গী এবং তাহাদের সঙ্গলাভ একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে খুব ভালরূপে অবগত আছেন।

এই ধরনের ঘটনা বহু সাহাবীর জীবনে ঘটিয়াছে। আর এইরূপ হওয়া জরুরী ছিল। কেননা যেখানে মহব্বত সেখানে হাজারো সন্দেহ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীর উত্তরে এই আয়াতই শুনাইলেন।

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আপনার সহিত এইরূপ মহব্বত যে, যখন আপনার কথা মনে পড়ে যদি ঐ সময় যিয়ারত না করিয়া লই তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু আমার চিন্তা হইল যে, আমি যদি জান্নাতে দাখিলও হই তবুও আপনার নিচের দরজায় থাকিব। আপনার দীদার ব্যতীত আমার জন্য জান্নাতও বড় কষ্ট হইবে। তখন তিনি উক্ত আয়াতই শুনাইলেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি চিন্তাযুক্ত কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি চিন্তায় আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চিন্তা? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সকাল-বিকাল আপনার খেদমতে হাজির হই, আপনার যিয়ারত করিয়া আনন্দ লাভ করি, আপনার খেদমতে বসি। কাল কিয়ামতে তো আপনি নবীদের মর্তবায় পৌঁছিয়া যাইবেন, আমরা তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিব না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকিলেন। যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আনসারী (রাযিঃ)কেও ডাকিলেন এবং তাহাকে ইহার সুসংবাদ দিলেন।

এক হাদীসে আছে, বহু সাহাবী এই ধরনের প্রশ্ন করিয়াছেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এই আয়াত শুনাইয়াছেন।

এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো সুস্পষ্ট বিষয় যে, নবীর মর্যাদা উম্মতের উপরে রহিয়াছে। জান্নাতে তাঁহারা উপরের দরজায় থাকিবেন। তাহা হইলে একত্র হওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উপরের স্তরের লোকেরা নিচের স্তরের লোকদের নিকট আসিবে, তাহাদের নিকটে বসিবে কথাবার্তা বলিবে। (দুররে মানসূর)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার সহিত অধিক মহব্বতকারী কিছুলোক এমন হইবে যাহারা আমার পরে জন্মগ্রহণ

করিবে এবং তাহাদের এই আকাংখা হইবে যে, যদি সমস্ত ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের বিনিময়েও আমাকে দেখিতে পারিত!

খালেদ (রাযিঃ)এর কন্যা আবদা বলেন, আমার পিতা যখনই ঘুমানোর জন্য শুইতেন ঘুম না আসা পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ মহব্বত ও আগ্রহে বিভোর হইয়া থাকিতেন আর মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের নাম লইয়া স্মরণ করিতে থাকিতেন আর বলিতেন যে, ইহারাই আমার মূল ও শাখা। (অর্থাৎ বড় এবং ছোট)। তাহাদের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে। হে আল্লাহ! আমাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিয়া দিন, যাহাতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। এই বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া যাইতেন।

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার পিতার মুসলমান হওয়ার চেয়ে আপনার চাচা আবু তালেবের মুসলমান হইয়া যাওয়া বেশী কাম্য। কেননা উহাতে আপনি বেশী খুশী হইবেন। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা মুসলমান হওয়ার চেয়ে অধিক খুশীর বিষয়। কেননা আপনার ইসলাম গ্রহণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার রাত্রিবেলায় পাহারা দিতেছিলেন। একটি ঘর হইতে বাতির আলো দেখিতে পাইলেন এবং এক বৃদ্ধার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। সে পশম ধুনিতেছিল আর কবিতা পাঠ করিতেছিল, যাহার অর্থ এই—

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নেকলোকদের দুরূদ পৌঁছুক এবং পাক-পবিত্র পুণ্যবান লোকদের তরফ হইতে দুরূদ পৌঁছুক। নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাত্রিবেলায় এবাদতকারী ছিলেন এবং শেষ রাত্রে ক্রন্দনকারী ছিলেন। হায়! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আমি ও আমার মাহবুব কখনও একত্রিত হইতে পারিব কিনা। কারণ মৃত্যু বিভিন্ন অবস্থায় আসে। জানিনা আমার মৃত্যু কেমন অবস্থায় আসিবে। আর মৃত্যুর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা।

হযরত ওমর (রাযিঃ)ও এই কবিতাসমূহ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত বিলাল (রাযিঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন তাঁহার ইন্তিকালের সময় হইল, তখন তাঁহার স্ত্রী বিচ্ছেদের শোকে অস্থির হইয়া

বলিতে লাগিলেন, হায় আফসোস! তিনি বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! কতই না আনন্দের বিষয়! কাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করিব এবং তাঁহার সাহাবীগণের সহিত মিলিত হইব।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর ঘটনা—(যাহা ৫ম অধ্যায় ৯নং ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে) যখন তাঁহাকে শূলিতে চড়ানো হইতেছিল তখন আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, আমরা তোমাকে মুক্ত করিয়া দেই আর (খোদা না করুন) তোমার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যবহার করি? তখন যায়েদ (রাযিঃ) উত্তরে বলিলেন, খোদার কসম, আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরে থাকা অবস্থায় কাঁটাবিদ্ধ হইবেন আর উহার পরিবর্তে আমি আমার ঘরে আরামে থাকিতে পারিব। আবু সুফিয়ান বলিতে লাগিল, আমি কখনও কোন ব্যক্তির সহিত কাহাকেও এই পরিমাণ মহব্বত করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার সঙ্গীদের মহব্বত রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার বিভিন্ন আলামত উল্লেখ করিয়াছেন। কাযী ইয়ায বলেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে মহব্বত করে সে উহাকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। মহব্বতের অর্থ ইহাই। এইরূপ না হইলে উহা মহব্বত নহে বরং মহব্বতের দাবী মাত্র। অতএব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলামত হইল তাঁহার অনুসরণ করা, তাঁহার তরীকা অবলম্বন করা এবং তাঁহার কথা ও কাজ অনুযায়ী চলা, তাঁহার হুকুমসমূহ পালন করা, তিনি যেসব বিষয় হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাকা। সুখে-দুঃখে, অভাবে-সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় তাঁহার তরীকার উপর চলা। কুরআনে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ—আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসিয়া থাক তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন আর আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়াবান।

পরিশিষ্ট

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সহিত ব্যবহার ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর এই কয়েকটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ লেখা হইয়াছে, নতুবা তাহাদের অবস্থা বড় বড় কিতাবেও সংকুলান হইবে না। উর্দুতেও এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট কিতাবাদি পাওয়া যায়। কয়েক মাস হইল এই কিতাবটি লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু মাদ্রাসার ব্যস্ততা এবং অন্যান্য সাময়িক অসুবিধার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিয়াই শেষ করিতেছি, যেন যাহা লেখা হইয়াছে তাহা উপকারী হয়।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া একান্ত জরুরী মনে করিতেছি। আর তাহা এই যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে যেইক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের অন্যান্য বহু বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে সেইক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর হক এবং তাহাদের আদব এহতেরামের ব্যাপারেও সীমাহীন ত্রুটি হইতেছে। বরং ইহা অপেক্ষাও মারাত্মক হইল দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন কিছু লোক তো তাহাদের শানে বেয়াদবী পর্যন্ত করিয়া বসে। অথচ সাহবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইলেন দ্বীনের বুনিয়াদ। সর্বপ্রথম তাঁহারাই দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন। সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাদের হক আদায় করিতে পারিব না। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাঁহাদের প্রতি লাখো রহমত নাযিল করুন। কেননা তাঁহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দ্বীন হাসিল করিয়া আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। তাই এই পরিশিষ্টে কাযী ইয়ায (রহঃ)এর শিফা নামক কিতাবের একটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত তরজমা যাহা এই ক্ষেত্রে উপযোগী, উল্লেখ করিতেছি এবং ইহার উপরেই এই পুস্তিকা সমাপ্ত করিতেছি।

তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে তাঁহার সাহাবীগণকে সম্মান করা, তাঁহাদের হক জানা, তাঁহাদের অনুসরণ করা, তাঁহাদের প্রশংসা করা, তাঁহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তাঁহাদের পারপস্পরিক মতানৈক্য সম্পর্কে সমালোচনা না করা। ঐতিহাসিক, শিয়া, বেদআতী এবং জাহেল বর্ণনাকারীদের ঐ সমস্ত বর্ণনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, যাহা তাঁহাদের

সম্পর্কে অবমাননাকর। যদি এই ধরনের কোন বর্ণনা কানে আসে তবে উহার কোন ভাল ব্যাখ্যা করিবে এবং কোন ভাল অর্থ নির্ধারণ করিবে যাহা তাঁহাদের শানের উপযোগী হয়। তাঁহাদের কোন দোষ বর্ণনা করিবে না বরং তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিবে এবং দোষণীয় বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিবে। যেমন হুযূর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমার সাহাবীদের (মন্দ) আলোচনা হয় তখন চুপ থাক।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۭ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ—মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর যাহারা তাহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদের মোকবিলায় অত্যন্ত কঠোর আর পরস্পরে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে তাহারা কখনও রুকু অবস্থায় আছে কখনও সেজদারত আছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির তালাশে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের বন্দেগীর আলামত তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুট হইয়া আছে। তাহাদের এইসব গুণ তাওরাতে রহিয়াছে আর ইঞ্জিলে তাহাদের এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন শস্য যাহা প্রথমে আপন অঙ্কুর বাহির করিল, অতঃপর উহা আপন অংকুরকে শক্তিশালী করিল, অর্থাৎ উক্ত শস্য মোটা তাজা হইল। তারপর উহা আরও মোটা তাজা হইল অতঃপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা দাঁড়াইয়া গেল, ফলে কৃষকদের আনন্দবোধ হইতে লাগিল। (তদ্রূপ সাহাবাদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল, অতঃপর দিন দিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে এই জন্য এইরূপ ক্রমোন্নতি দান করিলেন) যেন কাফেরদিগকে হিংসার আগুনে বিদগ্ধ করেন। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল ব্যক্তিদের সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন।

'তাওরাত' শব্দের উপর যদি আয়াত শেষ হয় তবে এরূপ তরজমা হইবে যাহা উপরে করা হইয়াছে। আর আয়াতের পার্থক্যের কারণে অর্থেও পার্থক্য হইয়া যাইবে, যাহা তফসীরের কিতাবসমূহ হইতে বুঝা যাইতে পারে। উক্ত সূরারই অপর এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন (যাহারা আপনার সফরসঙ্গী), যখন তাহারা আপনার সহিত গাছের নীচে অঙ্গীকার করিতেছিল এবং তাহাদের অন্তরে যাহা কিছু (এখলাছ ও মজবুতি) ছিল উহাও আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে একটি নিকটবর্তী বিজয়ও দান করিলেন। (ইহা দ্বারা খায়বরের বিজয়কে বুঝানো হইয়াছে, যাহা উহার একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হইয়াছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বড় যবরদস্ত হেকমতওয়ালা।

(সূরা ফাত্হ, রুকূ-৩)

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ব্যাপারে এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۡ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

অর্থ—ঐ সকল মুমেনের মধ্যে কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিল উহাতে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতক এমন রহিয়াছে যাহারা আপন মান্নত পূর্ণ করিয়াছে (অর্থাৎ শহীদ হইয়া গিয়াছে।) আর কতক তাহাদের মধ্যে উহার জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষায় রহিয়াছে (এখনও শহীদ হয় নাই) এবং নিজেদের এরাদার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটায় নাই।

এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

অর্থ—যে সমস্ত মুহাজির এবং আনসারগণ (ঈমান আনয়ন ক্ষেত্রে সকল উম্মত হইতে) অগ্রবর্তী আর যে সকল লোক এখলাসের সহিত তাহাদের অনুগামী হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তাহারা সকলে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন যেইগুলির তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত হইবে যাহাতে তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং ইহা বড় কামিয়াবী।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের প্রশংসা এবং তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসেও অত্যধিক পরিমাণে তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার পর আবু বকর (রাযিঃ) ও ওমর (রাযিঃ)এর অনুসরণ করিও। এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ তারকার ন্যায়। তোমরা যাহারই অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দেসগণের আপত্তি রহিয়াছে। এইজন্যই কাযী ইয়ায (রহঃ) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। তবে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হইতে পারে একাধিক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে উক্ত হাদীস তাঁহার নিকট নির্ভরযোগ্য অথবা ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। (কেননা ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস সামান্য দুর্বলতা সত্ত্বেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার সাহাবীদের দৃষ্টান্ত খাদ্যের মধ্যে লবণের ন্যায় যেমন খাদ্য লবণ ব্যতীত সুস্বাদু হইতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাহাদিগকে সমালোচনার পাত্র বানাইও না। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি মহব্বত রাখে, আমার মহব্বতের কারণে তাহাদের প্রতি মহব্বত রাখে আর যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে তাহাদিগকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় অতিসত্বর পাকড়াও হইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে,

আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ খরচ করে তবে উহা সাওয়াবের দিক হইতে সাহাবাদের এক মুদ বা আধা মুদের সমানও হইতে পারে না। (এক মুদ প্রায় এক সের–এর সমান)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সাহাবীদিগকে গালি দিবে তাহার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত। না তাহার ফরয কবুল হইবে, না নফল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নবীগণ ব্যতীত অন্য সমস্ত মানুষ হইতে আমার সাহাবীদিগকে বাছাই করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে চারজনকে স্বাতন্ত্র দান করিয়াছেন–আবু বকর (রাযিঃ), ওমর (রাযিঃ), ওসমান (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ)। তাহাদিগকে আমার সাহাবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আবু বকর (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনকে সোজা করিল, যে ওমর (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনের সুস্পষ্ট রাস্তা পাইল, যে ওসমান (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত হইল আর যে আলী (রাযিঃ)কে ভালবাসিল সে দ্বীনের মজবুত রশি ধারণ করিল। যে সাহাবীগণের প্রশংসা করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত আর যে সাহাবীদের সহিত বেআদবী করে সে বেদআতী, মুনাফেক ও সুন্নতের বিরোধী। আমার আশংকা হয় যে, তাহার কোন আমল কবুল হইবে না, যে পর্যন্ত তাহাদের সকলের প্রতি মহব্বত না রাখিবে এবং তাহাদের সম্পর্কে দিল সাফ না হইবে।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকেরা! আমি আবু বকরের প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা তাহার মর্যাদা বুঝিও। আমি ওমর, আলী, ওসমান, তালহা, যুবাইর, সা'দ, সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)এর প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা তাহাদের মর্যাদা বুঝিও। হে লোকেরা! আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে এবং হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে আর ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে যাহাদের কন্যারা আমার বিবাহের মধ্যে আছে অথবা আমার কন্যারা যাহাদের বিবাহের মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, তাহারা কেয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ করিয়া বসে। কেননা উহা মাফ

করা হইবে না।

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবী এবং আমার জামাতাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিও। যে ব্যক্তি তাহাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া আখেরাতে হেফাজত করিবেন আর যে ব্যক্তি তাহাদের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল করিবে না আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত, অসম্ভব নয় যে, সে কোন আযাবে পাকড়াও হইয়া যাইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার হেফাজতকারী হইব।

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে সে আমার নিকট হাউজে কাউসারে পৌঁছিতে পারিবে আর যে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল করিবে না সে আমার নিকট হাউজ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না এবং আমাকে শুধু দূর হইতে দেখিবে।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সম্মান করে না সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই ঈমান আনে নাই।

আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাঁহার শাস্তি এবং আপন মাহবুবের অসন্তুষ্টি হইতে আমাকে, আমার বন্ধু-বান্ধবকে, আমার হিতাকাঙ্খীদেরকে, আমার সহিত সাক্ষাতকারীদেরকে আমার শাইখ ও ছাত্রদিগকে ও সমস্ত মুমেন মুসলমানকে রক্ষা করুন এবং আমাদের অন্তরসমূহকে সাহাবায়ে কেরামদের মহব্বতে পরিপূর্ণ করিয়া দিন—আমীন

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلٰى اَتْبَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهِمْ حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ

যাকারিয়া উফিয়া আনহু কান্ধলভী
মুকীম ঃ মাদ্রাসা মাযাহেরে উলূম, সাহারানপুর
১২ই শাওয়াল, ১৩৫৭ হিঃ, সোমবার

॥ ॥ ॥

সূচীপত্র

ফাযায়েলে রমযান

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমযান মাসের ফাযায়েল ৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরের বয়ান ৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের বর্ণনা ৭৮

॥॥॥

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ
حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর। এই কিতাবে রমযানুল মুবারকের সহিত সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ করা হইয়াছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে যে সকল ফযীলত ও উৎসাহমূলক হাদীস এরশাদ করিয়া গিয়াছেন উহার আসল শোকরিয়া ও কদর তো এইভাবেই হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা নিজেদের জান কোরবান করিয়া উহার উপর আমল করি। কিন্তু দ্বীনের প্রতি আমাদের অলসতা ও গাফলতী এমনভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, উহার উপর আমল তো দূরের কথা ; এই সমস্ত হাদীসের প্রতি আমরা এমন উদাসীন ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছি যে, এইসব বিষয় সম্পর্কে এখন মানুষের এলেমের পরিমাণও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখার উদ্দেশ্য হইল, মসজিদের ইমাম, তারাবীর হাফেয সাহেবান এবং দ্বীনের প্রতি কোন পর্যায়ে অনুরাগী শিক্ষিত লোকেরা রমযান মাসের শুরুর দিনগুলিতে এই কিতাবখানা বিভিন্ন মসজিদে ও মজলিসে পড়িয়া শুনাইবেন। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত হইতে অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, এরূপ করার দ্বারা আল্লাহর মাহবুব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও ইরশাদের বরকতে আমাদের অন্তরে এই মুবারক মাসের কিছু না কিছু কদর পয়দা হইবে এবং এই মুবারক মাসের অফুরন্ত বরকতের প্রতি আমাদের কিছু না কিছু মনোযোগ সৃষ্টি হইবে। বেশী বেশী নেক আমল করার এবং বদ আমল কমিয়া যাওয়ার উপায় হইয়া যাইবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার ওসীলায় এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত নসীব করেন, তবে ইহা তোমার জন্য অনেকগুলি লাল উট (যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে) পাওয়ার

চাইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইবে।

মাহে রমযান মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় নেয়ামত ও পুরস্কার। কিন্তু ইহা তখনই হইবে যখন এই পুরস্কারের কদর করা হইবে। নতুবা আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য কেবল 'রমযান' 'রমযান' বলিয়া এক মাস যাবৎ চিৎকার করিতে থাকা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

এক হাদীসে আছে, মানুষ যদি জানিত যে, রমযান কি জিনিস ; তাহা হইলে আমার উম্মত এই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, সারা বৎসর যেন রমযান হইয়া যায়। এই কথা প্রত্যেকেই বুঝে যে, সারা বৎসর রোযা রাখা কত কঠিন! তা সত্ত্বেও রমযানের সওয়াবের মোকাবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছেন যে, মানুষ ইহার আকাঙ্ক্ষা করিত।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি (চন্দ্র) মাসের তিন দিনের রোযা দিলের ময়লা ও ওয়াসওয়াসা দূর করিয়া দেয়। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, নতুবা জিহাদের সফরে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এহতেমাম ও গুরুত্বের সহিত কেন রোযা রাখিতেন। এমনকি তাহাদেরকে হুকুম করিয়া নিষেধ করিতে হইয়াছিল।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের সফরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল, অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সকলের নিকট রৌদ্রের গরম হইতে বাঁচিবার মত কাপড়ও ছিল না। অনেকেই হাত দ্বারা ছায়া করিয়া রৌদ্র হইতে মাথা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তাহারা রোযাদার ছিলেন। অনেকে রোযার দরুন দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত ছিল, যাহারা প্রায় সব সময় সারা বৎসর রোযা অবস্থায়ই থাকিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শত শত রেওয়ায়াতে বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। সবগুলি পুরাপুরি বর্ণনা করা আমার মত অধমের শক্তির বাহিরে। আবার ইহাও মনে হয় যে, এইসব রেওয়ায়াত যদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করি, তবে পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইবেন। কেননা, বর্তমান যমানায় দ্বীনি বিষয়ে যে পরিমাণ অবহেলা করা হইতেছে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এলেম ও আমল উভয় দিক হইতে কি পরিমাণ বেপরওয়াভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা লইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। এইজন্য

মাত্র একুশটি হাদীস তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—রমযানের ফযীলত ; ইহাতে দশটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শবে কদরের বিবরণ ; ইহাতে সাতটি হাদীস রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—এতেকাফের বর্ণনা ; ইহাতে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতঃপর পরিশিষ্টে একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করিয়া কিতাবখানা সমাপ্ত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা নিজ ক্ষমাগুণে এবং তাঁহার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে ইহাকে কবূল করিয়া নিন এবং আমি অধম গোনাহগারকেও ইহার বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন। فَإِنَّهُ بَرٌّ جَوَادٌ كَرِيمٌ

ফাযায়েলে রমযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমযান মাসের ফাযায়েল

(١) عَنْ سَلْمَانَؓ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ شَهْرٌ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْ مَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيْهِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي اللّٰهُ

حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے، (شب قدر) جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام (یعنی تراویح) کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو

هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى
تَمْرَةٍ اَوْشَرْبَةِ مَاءٍ اَوْ مَذْقَةِ
لَبَنٍ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَ
اَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ
مِّنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ
فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ
وَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ
خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا
رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ
عَنْهُمَا فَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ
تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ اَنْ
لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَاَمَّا
الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ
عَنْهُمَا فَتَسْئَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَ
تَعُوْذُوْنَ بِهٖ مِنَ النَّارِ وَمَنْ سَقٰى
صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ
شَرْبَةً لَّا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔
(رواه ابن خزيمة فى صحيحه و
قال ان صح الخبر ورواه البيهقى و
رواه ابوالشيخ ابن حبان فى الثواب
باختصار عنهما و فى اسانيدهم
على بن زيد بن جدعان ورواه ابن
خزيمة ايضًا والبيهقى باختصار عنه
من حديث ابى هريرة وفى اسناده
كثير بن زيد كذا فى الترغيب قلت
على بن زيد ضعفه جماعة وقال

ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب
سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہؓ نے
عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم میں سے ہر
شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ
دار کو افطار کرائے تو آپؐ نے فرمایا کہ
(پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں) یہ
ثواب تو اللہ جل شانہٗ ایک کھجور سے
کوئی افطار کرادے یا ایک گھونٹ پانی
پلادے یا ایک گھونٹ لسّی پلادے اس
پر بھی مرحمت فرمادیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ
ہے کہ اس کا اوّل حصّہ اللہ کی رحمت ہے
اور درمیانی حصّہ مغفرت ہے اور آخری حصّہ
آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینہ میں
ہلکا کردے اپنے غلام (وخادم) کے بوجھ کو
حق تعالےٰ شانہٗ اس کی مغفرت فرماتے ہیں
اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور چار چیزوں
کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے دو
چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں
ایسی ہیں کہ جن سے تمھیں چارہ کار نہیں پہلی
دو چیزیں جن سے تم اپنے رَبّ کو راضی کرو
وہ کلمہ طیّبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری
دو چیزیں یہ ہیں کہ جنّت کی طلب کرو اور
آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو
پانی پلائے حق تعالیٰ (قیامت کے دن)
میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں
گے جس کے بعد جنّت میں داخل

الترمذى صدوق وصحح له حديثا ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔
فى الاسلام وحسن له غير ما حديث وكذا كثير ضعفه النسائى وغيره قال
ابن معين ثقة وقال ابن عدى لم ار بحديثه باسا واخرج بحديثه
ابن خزيمة فى صحيحه كذا فى رجال المنذرى صـ لكن قال العينى
الخبر منكر فتامل)

(১) হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদিগকে নসীহত করিয়াছেন যে, তোমাদের উপর এমন একটি মাস আসিতেছে, যাহা অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও বরকতময়। এই মাসে এমন একটি রাত্র (শবে কদর) রহিয়াছে, যাহা হাজারো মাস হইতে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসে রোযা রাখাকে ফরজ করিয়াছেন এবং এই মাসের রাত্রগুলিতে নামায (অর্থাৎ তারাবীহ) পড়াকে সওয়াবের কাজ বানাইয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এই মাসে কোন নফল এবাদত করিল, সে যেন রমযানের বাহিরে একটি ফরজ আদায় করিল। আর যে ব্যক্তি এই মাসে কোন ফরজ আদায় করিল সে যেন রমযানের বাহিরে সত্তরটি ফরজ আদায় করিল। ইহা ছবরের মাস আর ছবরের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত রাখিয়াছেন। ইহা মানুষের সহিত সহানুভূতির মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, ইহা তাহার জন্য গোনাহমাফী ও জাহান্নাম হইতে মুক্তির কারণ হইবে এবং সে রোযাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবের মধ্যে কোন কম করা হইবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তো এমন সামর্থ্য রাখে না যে, রোযাদারকে ইফতার করাইতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, (পেট ভর্তি করিয়া খাওয়াইতে হইবে না) এই সওয়াব তো আল্লাহ তায়ালা একটি খেজুর খাওয়াইলে অথবা এক ঢোক পানি পান করাইলে অথবা এক চুমুক দুধ পান করাইলেও দান করিবেন। ইহা এমন মাস যে, ইহার প্রথম অংশে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মধ্যের অংশে গোনাহ মাফ করা হয় এবং শেষ অংশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে আপন গোলাম (ও কর্মচারী বা খাদেম)এর কাজের বোঝা হালকা করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দেন এবং জাহান্নামের আগুন

হইতে মুক্তি দান করেন। এই মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করিতে থাক। তন্মধ্যে দুইটি কাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য আর দুইটি কাজ এইরূপ যাহা না করিয়া তোমাদের উপায় নাই। প্রথম দুই কাজ যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করিবে উহা এই যে, অধিক পরিমাণে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িবে এবং এস্তেগফার করিবে। আর দুইটি কাজ হইল, আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত পাওয়ার জন্য দোয়া করিবে এবং জাহান্নাম হইতে মুক্তির জন্য দোয়া করিবে। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি পান করাইবে, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আমার হাউজে কাউসার হইতে এইরূপ পানি পান করাইবেন যাহার পর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসা লাগিবে না।

(তারগীব ঃ ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করিলেও প্রথমতঃ ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসের ব্যাপারে ঐটুকু মন্তব্য সহনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়বস্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়—

প্রথম বিষয় ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের বিশেষ এহতেমাম করিয়াছেন, যে কারণে তিনি রমযানের পূর্বে শাবান মাসের শেষ তারিখে ইহার গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে নসীহত করিয়াছেন এবং লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, রমযানুল মুবারকের একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় বা অবহেলার মধ্যে কাটিয়া না যায়। এই নসীহতের মধ্যে তিনি পূরা মাসের ফযীলত বয়ান করিয়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল, শবে কদর। এই শবে কদর প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত্র (ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পৃথকভাবে আসিতেছে)। অতঃপর তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসের রোযা ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তারাবীর নামাযকে সুন্নত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাবীর নামাযের হুকুমও স্বয়ং আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন যে, তারাবীহকে আমি সুন্নত করিয়াছি, ইহার অর্থ হইল, গুরুত্ব দেওয়া। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার প্রতি অনেক বেশী

গুরুত্ব দিতেন। এই কারণেই সকল ইমাম ইহার সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে একমত। 'বুরহান' কিতাবে আছে, একমাত্র রাফেজী সম্প্রদায় ছাড়া এই নামাযকে আর কেহ অস্বীকার করে না।

হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) 'মা ছাবাতা বিস-সুন্নাহ' কিতাবে কোন কোন ফেকার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন যে, কোন শহর বা এলাকার লোকেরা যদি তারাবীর নামায ছাড়িয়া দেয়, তবে ইহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে মুসলমান শাসনকর্তা তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে পড়িতে বাধ্য করিবেন।

এইখানে বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অনেকেরই ধারণা যে, তাড়াহুড়া করিয়া আট দশ দিনে কুরআন খতম শুনিয়া লইবে অতঃপর ছুটি। ইহা খেয়াল রাখিবার বিষয় যে, এইখানে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সুন্নত রহিয়াছে—একটি হইল পুরা কুরআন শরীফ তারাবীতে পড়া বা শোনা। আর দ্বিতীয়টি হইল পুরা রমযান মাস তারাবীহ পড়া। সুতরাং এমতাবস্থায় একটি সুন্নতের উপর আমল হইল আর অন্য সুন্নতটি বাদ পড়িয়া গেল। অবশ্য যে সমস্ত লোকের রমযান মাসে সফর ইত্যাদি কিংবা অন্য কোন কারণে এক এলাকায় থাকিয়া তারাবীর নামায আদায় করা মুশকিল হয় তাহাদের জন্য উত্তম হইল, রমযানের শুরুর দিকেই কয়েক দিনে তারাবীর নামাযের মধ্যে পুরা কুরআন শরীফ শুনিয়া লইবেন। যাহাতে কুরআন শরীফ অসম্পূর্ণ থাকিয়া না যায়। অতঃপর যেখানে সময় সুযোগ হইবে সেখানে তারাবীহ পড়িয়া লইবেন। এইভাবে করিলে কুরআন শরীফের খতমও অসম্পূর্ণ থাকিবে না এবং নিজের কাজ-কর্মেরও কোন ক্ষতি হইবে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও তারাবীর আলোচনার পর অন্যান্য ফরজ ও নফল এবাদতসমূহের এহতেমাম করিবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মাসে একটি নফলের সওয়াব অন্যান্য মাসের ফরজের সমান এবং একটি ফরজের সওয়াব অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমান।

এইখানে আমাদের নিজ নিজ এবাদতসমূহের প্রতিও একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, এই মোবারক মাসে আমরা ফরজ এবাদতগুলির কতটুকু এহতেমাম করিয়া থাকি এবং নফল এবাদত আমরা কতটুকু বাড়াইয়া দেই। ফরজ আদায়ের ব্যাপারে আমাদের এহতেমামের অবস্থা তো এই যে, সেহরী খাওয়ার পর যে ঘুমাইয়া যাওয়া হয় ইহাতে অধিকাংশ সময় ফজরের নামায কাজা হইয়া যায়। আর তা না হইলে অন্ততঃ

জামাতে নামায আদায় তো অধিকাংশ লোকেরই ছুটিয়া যায়। এইভাবে যেন আমরা সেহরী খাওয়ার শোকরিয়া আদায় করিলাম যে, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজকে একেবারে কাজা করিয়া দিলাম। অথবা উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়া দিলাম। কেননা শরীয়তের মূলনীতিবিদগণ জামাত ছাড়া নামায আদায়কে অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এক হাদীসে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—যাহারা মসজিদের নিকটে থাকে তাহাদের নামায মসজিদ (অর্থাৎ জামাত) ছাড়া (যেন) আদায়ই হয় না। 'মাজাহিরে হক' কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জামাত ছাড়া নামায পড়ে তাহার জিম্মা হইতে ফরজ তো আদায় হইয়া যায় কিন্তু সে নামাযের সওয়াব পায় না।

এইভাবে আরেক নামায মাগরিবের জামাতও অনেকের ইফতারের দরুন ছুটিয়া যায়—প্রথম রাকাত বা তাকবীরে উলার তো প্রশ্নই উঠে না। আবার অনেকেই তারাবীর বাহানায় এশার জামাত ওয়াক্তের আগেই পড়িয়া লয়। ইহা তো হইল রমযান মুবারকে আমাদের নামাযের অবস্থা, যে নামায সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। অর্থাৎ এক ফরজ (রোযা) পালন করিতে গিয়া উহার বদলে তিন ফরজ অর্থাৎ তিন ওয়াক্ত নামায বরবাদ করা হইল। এই তিন ওয়াক্ত তো প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। আর যোহরের নামায (কায়লূলা অর্থাৎ) দুপুরের বিশ্রামের খাতিরে এবং আছরের জামাত ইফতারীর সামান খরিদ করিবার পিছনে যে কোরবানী হইয়া যায় তাহা তো চোখের সামনে দেখা গিয়াছে। এইভাবে অন্যান্য ফরজ এবাদতের বিষয় নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, রমযানের মুবারক মাসে সেইগুলির কতটুকু এহতেমাম করা হয়।

যখন ফরজ এবাদতগুলিরই এই অবস্থা তখন নফল এবাদতের তো আর প্রশ্নই উঠে না। এশরাক ও চাশতের নামায তো রমযানের ঘুমের জন্যই উৎসর্গ হইয়া যায়। আওয়াবীন নামাযের এহতেমাম কিভাবে হইবে যখন এইমাত্র রোযা খোলা হইল আবার একটু পরেই তারাবীহ আসিতেছে। আর তাহাজ্জুদ নামাযের সময় তো একেবারে সেহরী খাওয়ার সময়ই। কাজেই নফল এবাদতের সুযোগ কোথায়? কিন্তু এই সবকিছু অবহেলা এবং আমল না করার বাহানা মাত্র।

ع "تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں"

"তুমি নিজেই যদি কাজ করিতে না চাও, তবে ইহার জন্য হাজারো যুক্তি খাড়া করিতে পার।"

আল্লাহ তায়ালার কত বান্দা এমন রহিয়াছেন, যাহাদের জন্য এই সময়ের ভিতরেই সবকিছু করিবার সুযোগ হইয়া যায়। আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)কে একাধিক রমযানে দেখিয়াছি যে, স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও মাগরিবের পর নফলের মধ্যে সোয়া পারা পড়িতেন অথবা শুনাইতেন। অতঃপর আধা ঘন্টার মধ্যেই খানাপিনা ইত্যাদি জরুরত হইতে ফারেগ হইয়া হিন্দুস্থানে অবস্থান কালে প্রায় দুই সোয়া দুই ঘন্টা তারাবীর নামাযে ব্যয় করিতেন। আর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান কালে এশা ও তারাবীর নামাযে প্রায় তিন ঘন্টা লাগিয়া যাইত। ইহার পর তিনি মৌসুমের তারতম্য হিসাবে দুই অথবা তিন ঘন্টা আরাম করিয়া তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত করিতেন এবং ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আধা ঘন্টা আগে সেহরী খাইতেন। সেহরীর পর ফজরের নামায পর্যন্ত কখনও মুখস্থ তেলাওয়াত করিতেন, আর কখনও ওজীফা ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। সকালের আলো পরিষ্কার হইয়া গেলে ফজরের নামায পড়িয়া এশরাক পর্যন্ত মুরাকাবা করিতেন। এশরাকের পর প্রায় এক ঘন্টা আরাম করিতেন। ইহার পর হইতে প্রায় বারটা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে একটা পর্যন্ত 'বযলুল-মাজহূদ' কিতাব লিখিতেন এবং চিঠিপত্র দেখিতেন ও জবাব লিখাইতেন। অতঃপর যোহরের নামায পর্যন্ত আরাম করিতেন। যোহরের নামাযের পর হইতে আছর পর্যন্ত তেলাওয়াত করিতেন। আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির ও তসবীহে মশগুল থাকিতেন এবং উপস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্তাও বলিতেন। 'বযলুল মাজহূদ' কিতাব লেখা শেষ হইবার পর সকালের কিছু সময় তেলাওয়াতে ও বিভিন্ন কিতাব পড়িয়া কাটাইতেন। এই সময় প্রায়ই 'বযলুল-মাজহূদ' ও 'ওয়াফাউল-ওয়াফা' কিতাব দুইখানা পড়িতেন। রমযান মুবারকে তাঁহার মামূলাত বা নিয়মিত আমলে বিশেষ কোন রদ-বদল হইত না। কেননা, এই পরিমাণ নফলের অভ্যাস তাঁহার অন্যান্য সময়েও ছিল ; সারা বৎসর তিনি এইসব আমলের এহতেমাম করিতেন। অবশ্য নামাযের রাকাতগুলি রমযান মাসে দীর্ঘ হইত। না হয় অন্যান্য আকাবির বুযুর্গগণের রমযান মাসে আরও ভিন্ন ও খাছ মামূলাত ছিল, যেগুলির পুরাপুরি অনুসরণ করা সকলের জন্য সহজ নয়।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) তারাবীর পর হইতে ফজর পর্যন্ত সারারাত্র নফল নামাযে মশগুল থাকিতেন এবং একের পর এক কয়েকজন হাফেজে কুরআনের পিছনে কুরআন মজীদ শুনিতে থাকিতেন। হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পূরী

(রহঃ)এর দরবারে তো পূরা রমযান মাস দিন–রাত্র কেবল তেলাওয়াতই চলিতে থাকিত। এই সময় ডাক–যোগাযোগ ও চিঠিপত্রের আদান–প্রদান বন্ধ থাকিত। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করাও পছন্দ করিতেন না। কোন কোন খাছ খাদেমকে শুধু এতটুকু অনুমতি দেওয়া ছিল যে, তারাবীর পর যতটুকু সময় তিনি দুই এক পেয়ালা রং চা পান করিবেন তখন তাহারা সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। আল্লাহওয়ালাদের অভ্যাস ও মামুলাতসমূহ মামুলী দৃষ্টিতে পড়িয়া নেওয়া বা দু' একটি মুখরোচক কথা বলিয়া দেওয়ার জন্য লিখা হয় না বরং, এইজন্য লিখা হয় যেন নিজ নিজ হিম্মত অনুযায়ী তাঁহাদের অনুসরণ করা হয় এবং এইসব মামূলাত পূরা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কেননা, আল্লাহওয়ালাদের প্রত্যেকেরই তরীকা ও নিয়ম–পদ্ধতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি অপরটি হইতে উত্তম। যাহারা দুনিয়াবী ঝামেলা হইতে মুক্ত তাহাদের জন্য কত চমৎকার সুযোগ যে, দীর্ঘ এগারটি মাস বৃথা কাটাইয়া দেওয়ার পর একটি মাত্র মাস আল্লাহর এবাদতে প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়া যাইবে। যাহারা চাকুরীজীবী ; সকাল দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত অফিসে থাকিতে বাধ্য, তাহারা ফজর হইতে দশটা পর্যন্ত অন্ততঃ রমযান মাসটি যদি তেলাওয়াতের মধ্যে কাটাইয়া দেন তবে এক মাসের জন্য ইহা এমন কি কঠিন কাজ! নিজের দুনিয়াবী কাজের জন্য তো অফিসের বাহিরে অবশ্য সময় করিয়াই লওয়া হয়। (তাহা হইলে দ্বীনের জন্য ও এবাদতের জন্য সময় বাহির করিতে কি মুশকিল হইবে।)

যাহারা কৃষিজীবী তাহারা তো কাহারও অধীনস্থ নহেন এবং সময় পরিবর্তন করার ব্যাপারেও তাহাদের কোন বাধা নাই। এমনকি ক্ষেত–খামারে বসিয়াও তাহারা কুরআন তেলাওয়াত করিতে পারেন।

আর যাহারা তেজারত ও ব্যবসা–বাণিজ্যে রহিয়াছেন, তাহাদের জন্য তো রমযান মাসে দোকানদারীর সময় একটু কম করিয়া নেওয়া মোটেও কঠিন নয়। অথবা দোকানে বসিয়াই ব্যবসার সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াতের কাজও করিয়া নিবেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালামের সাথে এই মুবারক মাসের বড় বেশী খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে।

এই কারণেই আল্লাহ তায়ালার সব কয়টি কিতাব সাধারণতঃ এই মাসেই নাযিল হইয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফূজ হইতে দুনিয়ার আসমানে সম্পূর্ণত এই মাসেই নাযিল হইয়াছে। সেখান হইতে প্রয়োজন মত অল্প অল্প করিয়া তেইশ বৎসরে দুনিয়াতে নাযিল হইয়াছে। ইহা ছাড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সহীফাসমূহ এই মাসেই

পহেলা তারিখে অথবা তেসরা (অর্থাৎ তিন) তারিখে নাযিল হইয়াছে। হযরত দাউদ (আঃ)কে ১৮ই রমযানে অথবা ১২ই রমযানে যাবূর কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ)কে ৬ই রমযানে তাওরাত কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে ১২ অথবা ১৩ই রমযানে ইঞ্জীল দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কালামের সহিত এই মাসের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কারণেই এই মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং বুযুর্গ মাশায়েখগণ ইহাকে নিজেদের আদর্শ ও নিয়মিত আমল বানাইয়া লইয়াছেন।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বৎসর রমযান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনাইতেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিতেন। হাফেজদের দুই দুইজন মিলিয়া কুরআন শরীফ 'দাওর' করার যে নিয়ম চালু আছে, উপরোক্ত দুই হাদীস মিলাইয়া ওলামায়ে কেরাম এই নিয়মকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। মোটকথা, যতবেশী সম্ভব কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ এহতেমাম করিবে। আর তেলাওয়াতের পর যে সময় বাঁচিয়া যায় উহাও নষ্ট করা ঠিক হইবে না। কেননা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের শেষ অংশে চারটি জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ; এই মাসে এই কাজগুলি বেশী বেশী পরিমাণে করিবার হুকুম করিয়াছেন। কাজগুলি হইল—কালেমা তাইয়্যিবাহ, এস্তেগফার, জান্নাত হাসিল করার ও জাহান্নাম হইতে বাঁচার দোয়া করা। কাজেই যতটুকু সময়ই পাওয়া যায় উহাকে এই চার আমলের মধ্যে খরচ করা নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করিবে। এরূপ করার দ্বারাই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি ভক্তি ও কদর করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আর ইহা এমন কি কঠিন ব্যাপার যে, নিজের দুনিয়াবী কাজে মশগুল থাকিয়াও জবানে দুরূদ শরীফ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িতে থাকিবে। কাল কিয়ামতের দিন এই কথা বলিবার যেন মুখ থাকে—

میں گو رہا رہینِ ستم ہائے روزگار لیکن تمھاری یاد سے غافل نہیں رہا

অর্থাৎ, যদিও আমি জমানার অত্যাচারে জর্জরিত ছিলাম, তবুও তোমার স্মরণ হইতে (হে আল্লাহ! একেবারে) গাফেল থাকি নাই।

অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আদবের কথা এরশাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা

ছবরের মাস। অর্থাৎ রোযা রাখার কারণে যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে এই কষ্ট খুশী মনে সহ্য করা চাই। ধর-মার হাঁক-ডাক যেন না হয়, যেমন গরমের দিনের রোযায় অনেককেই এইরূপ করিতে দেখা যায়। এমনিভাবে যদি কখনও সেহরী না খাওয়া হইয়া থাকে, তবে তো সকাল হইতেই রোযার শোক-মাতম শুরু হইয়া যায়। তদ্রূপ রাত্রে তারাবীতে যদি কষ্ট হয় খুশী মনে উহা সহ্য করা চাই। ইহাকে আপদ বা মুসীবত মনে করিবে না ; এইরূপ মনে করা খুবই মারাত্মক মাহরূমী ও বঞ্চনার আলামত। যেখানে আমরা সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য খানাপিনা, আরাম-আয়েশ সবই ছাড়িয়া দিতে পারি, সেখানে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মোকাবিলায় এইসব বস্তুর কি মূল্য থাকিতে পারে?

অতঃপর এরশাদ হইয়াছে যে, ইহা সহানুভূতির মাস। অর্থাৎ গরীব-মিসকীনদের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার করার মাস। নিজের ইফতারীর জন্য যদি দশ রকমের জিনিস তৈয়ার করিয়া থাকি, তবে গরীবের জন্য তো অন্ততঃ দুই চার রকমের হওয়া উচিত। আসল নিয়ম তো ছিল তাহাদেরকে ভালটাই দিয়া দেওয়া ; তা না হইলে অন্ততঃ সমান করা। কাজেই যতখানি হিম্মত হয় নিজের সেহরী ও ইফতারীতে গরীবদেরও একটি অংশ অবশ্যই রাখা উচিত। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) উম্মতের জন্য আমলী নমুনা ছিলেন। দ্বীনের প্রতিটি কাজ তাঁহারা বাস্তবে করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন যে কোন আমল করিতে হয় ; ইহার জন্য তাঁহাদের আমলের সুপ্রশস্ত রাজপথ খোলা রহিয়াছে ; উহাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেই হইবে। 'ঈছার' অর্থাৎ অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ; নিজের উপর অন্যকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা করা—এইসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মত মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করার জন্যও সাহসী মানুষের দরকার। শত শত হাজার হাজার ঘটনা তাঁহাদের এমন আছে যেগুলি শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা লিখিতেছি—হযরত আবূ জাহ্‌ম (রাযিঃ) বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম এবং এই মনে করিয়া এক মশক পানিও সঙ্গে লইলাম যে, যদি তাঁহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসও বাকী থাকে, তবে তাঁহাকে পানি পান করাইব এবং হাত-মুখ ধোয়াইয়া দিব। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পানির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইশারায় পানি চাহিলেন। এমন সময় সামনের দিক হইতে আরেকজন আহত ব্যক্তি আহ্ করিয়া উঠিলেন। তখন আমার চাচাত ভাই নিজে পানি পান

না করিয়া সেই ব্যক্তিকে পানি পান করাইতে ইশারা করিলেন। তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তিনিও পিপাসার্ত এবং পানি চাহিতেছেন। এমন সময় তাহার পার্শ্বের আরেক ব্যক্তি ইশারায় পানি চাহিলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও পানি পান না করিয়া ঐ (তৃতীয়) ব্যক্তির নিকট যাইতে ইশারা করিলেন। আমি এই শেষ ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়াই দেখিতে পাইলাম তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ফিরিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসিলাম। দেখিলাম তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ফিরিয়া চাচাত ভাইয়ের নিকট পৌঁছিলাম। এইখানেও আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বার্থ-ত্যাগ ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার নমুনা। নিজেরা পিপাসায় কাতর হইয়া জীবন দিয়া দিলেন ; তবু অপরিচিত ভাইয়ের আগে পানি পান করা পছন্দ করিলেন না। আল্লাহ তাঁহাদের উপর রাজী হইয়া যান, তাঁহাদেরকে খুশী করুন এবং আমাদেরকে তাহাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

'রূহুল বয়ান' কিতাবে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)এর 'জামে সগীর' এবং আল্লামা সাখাবী (রহঃ)এর 'মাকাসেদ' কিতাবদ্বয়ের বরাত দিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় পাঁচশত বাছাই করা বুযুর্গ বান্দা এবং চল্লিশজন আবদাল থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিলে তখনই অন্য একজন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সকল লোকের বিশেষ আমলসমূহ কি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাহারা জুলুমকারীদেরকে মাফ করিয়া দেন, দুর্ব্যবহারকারীদের সাথেও তাহারা সদ্ব্যবহার করেন এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিকের দ্বারা তাহারা মানুষের সঙ্গে দয়া ও সহানুভূতির আচরণ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত কিতাবে আরেক হাদীস হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে রুটি খাওয়াইবে, বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাইবে অথবা মুসাফিরকে রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা দিবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাহাকে আশ্রয় দান করিবেন। ইয়াহ্ইয়া বারমাকী (রহঃ) সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)এর জন্য প্রতি মাসে একহাজার দেরহাম খরচ করিতেন। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) সেজদায় এই বলিয়া দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ!

ইয়াহইয়া আমার দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইয়াছে, তুমি মেহেরবানী করিয়া তাহার আখেরাতের প্রয়োজন মিটাইয়া দাও। ইহাহ্ইয়া বারমাকী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর লোকেরা তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। তাহার হাল-অবস্থা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুফিয়ান সাওরীর দোয়ার বদওলতে আমার মাগফেরাত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে ইফতার করাইবার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি হালাল কামাই দ্বারা রমযান মাসে কাহাকেও ইফতার করায়, তাহার উপর রমযানের রাত্রসমূহে ফেরেশতারা রহমত পাঠাইতে থাকেন এবং শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহার সহিত মোসাফাহা করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) যাহার সহিত মোসাফাহা করেন, তাহার দিলে নম্রতা পয়দা হয় এবং তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে। হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন ; তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশজন রোযাদারকে ইফতার করাইতেন।

ইফতারের ফযীলত বর্ণনা করিবার পর এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই মাসের প্রথম অংশ রহমত ; অর্থাৎ এই অংশে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ও পুরস্কার আগাইয়া আসিতে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার এই ব্যাপক রহমত সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য হইয়া থাকে। অতঃপর যাহারা এই রহমতের জন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে তাহাদের উপর রহমতের বর্ষণ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা শোকর করিলে অবশ্যই আমি (নেয়ামত ও পুরস্কার) বাড়াইয়া দিব। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৭)

এই মাসের মাঝের অংশ হইতে মাগফেরাত অর্থাৎ গোনাহমাফী শুরু হইয়া যায়। কারণ, রোযার কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়াছে ; উহার বদলা ও সম্মান স্বরূপ মাগফেরাত শুরু হইয়া যায়। আর এই মাসের শেষ অংশে তো আগুন হইতে একেবারে মুক্তিই হয়।

আরও অনেক রেওয়ায়াতে রমযান খতম হওয়ার সময় (জাহান্নামের) আগুন হইতে মুক্তির সুসংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

রমযানকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস হইতে জানা গিয়াছে। অধম বান্দার মতে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম হইতে মুক্তি—এই তিন অংশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—এক, ঐ সমস্ত লোক যাহাদের উপর গোনাহের বোঝা নাই ; এই সমস্ত লোকের জন্য তো রমযানের শুরু হইতেই রহমত

এবং নেয়ামত ও পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সমস্ত লোক যাহারা মামুলী গোনাহগার ; তাহাদের জন্য রমযানের কিছু অংশ রোযা রাখিবার পর এই রোযার বরকতে ও বদলায় মাগফেরাত হয়। আর তৃতীয় প্রকার ঐ সমস্ত লোক যাহারা বেশী গোনাহগার ; তাহাদের জন্য রমযানের বেশীর ভাগ রোযা রাখিবার পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি হয়। আর যাহাদের জন্য রমযানের শুরু হইতেই রহমত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাহাদের গোনাহ মাফ হইয়াছিল তাহাদের জন্য যে কি পরিমাণ আল্লাহর রহমতের স্তূপ লাগিয়া যাইবে, উহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি জিনিসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। উহা হইল এই যে, যাহারা মালিক বা মনিব অর্থাৎ যাহাদের অধীনে শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যেন এই মাসে কর্মচারীদের কাজ হালকা করিয়া দেন। কেননা, তাহারাও তো রোযাদার ; আর রোযা অবস্থায় কাজ বেশী হইলে রোযা রাখা কঠিন হয়। অবশ্য যদি কাজের পরিমাণ বেশী হয় তবে শুধু রমযান মাসে এক-আধজন কর্মচারী সাময়িকভাবে বাড়াইয়া নিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা তখনই করা হইবে যখন কর্মচারীগণও রোযাদার হয়। রোযাদার না হইলে তাহাদের জন্য তো রমযান মাস ও অন্যান্য মাস এক বরাবর। আর যে মালিক নিজেই রোযা রাখে না ; বেহায়া মুখে রোযাদার কর্মচারীদের দ্বারা কাজ নেয় এবং নামায-রোযার কারণে কাজে একটু শিথিলতা হইলে অকথ্য বর্ষণ শুরু করিয়া দেয় তাহাদের জুলুম ও নির্লজ্জতার কথা আর কি বলার আছে!

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ জালেমরা অতিসত্বর জানিতে পারিবে—তাহারা কোন্ ভয়াবহ স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে। (সূরা শু'আরা, আয়াত ঃ ২২৭)

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে চারটি কাজ বেশী বেশী করার হুকুম করিয়াছেন। প্রথমতঃ কালেমায়ে শাহাদত। অনেক হাদীসে এই কালেমায়ে শাহাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলা হইয়াছে। মিশকাত শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া বলিয়া দিন যাহার দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং দোয়া করিব। আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কথা বলিয়া দেওয়া হইল। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! এই কালেমা তো

আপনার সকল বান্দাই পড়িয়া থাকে ; আমি তো এমন একটি দোয়া বা যিকির চাই, যাহা শুধু আমার জন্যই খাছ হইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, হে মূসা! আমাকে ব্যতীত সাত আসমান ও উহার আবাদকারী সমস্ত ফেরেশতা এবং সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় কালেমা তাইয়্যেবাকে রাখা হয় তবে কালেমা তাইয়্যেবার পাল্লাই ভারী হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কালেমা পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আরশ পর্যন্ত এই কালেমা পৌঁছিতে কোন বাধা থাকে না ; তবে ইহার পাঠকারীকে কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত আদত ও নিয়ম হইল যে, সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ তিনি প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন এবং ব্যাপক করিয়া থাকেন। গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে যে জিনিসের প্রয়োজন যত বেশী সেই জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা ততই ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। যেমন পানি একটি ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস ; আল্লাহ তায়ালা অসীম রহমতে ইহাকে কত ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন! অথচ 'কিমিয়া' (মাটি, তামা ইত্যাদি কম মূল্যের পদার্থকে স্বর্ণ বানাইবার প্রক্রিয়া)–এর মত অনর্থক ও বেকার বিষয়কে কত দুষ্প্রাপ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে কালেমায়ে তাইয়্যেবা হইল সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির— বহু হাদীস দ্বারা এই কথা জানা যায় যে, সমস্ত যিকির–আযকারের উপর কালেমা তাইয়্যেবার প্রাধান্য রহিয়াছে। ইহাকে সকলের জন্য ব্যাপক ও সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যাহাতে কেহই মাহরূম না থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ মাহরূম থাকে তবে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য। মোটকথা, বহু হাদীসে কালেমা তাইয়্যেবার ফযীলতে বর্ণিত হইয়াছে ; কিতাব সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না।

দ্বিতীয় কাজ যাহা রমযান মাসে বেশী পরিমাণে করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে, তাহা হইল, এস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। বহু হাদীসে এস্তেগফারেরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে—' যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার করিবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন অভাব ও সংকটের সময় তাহার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন, যে কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য এমন রুজি–রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।' আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মানুষ

মাত্রই গোনাহগার ; তবে গোনাহগারদের মধ্যে উত্তম হইল ঐ ব্যক্তি যে তওবা করিতে থাকে।' এক হাদীসে আছে—'মানুষ যখন গোনাহ করে তখন একটি কালো বিন্দু তাহার দিলের মধ্যে লাগিয়া যায়। যদি সে ঐ গোনাহ হইতে তওবা করে তবে উহা ধুইয়া পরিস্কার হইয়া যায় ; নতুবা বাকী থাকিয়া যায়।'

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি জিনিস চাহিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন, যে দুইটি জিনিস ছাড়া কোন উপায় নাই। একটি হইল, জান্নাত পাওয়ার দোয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার দোয়া। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাদের সকলকে উহা দান করুন, আমীন।

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيَتْ اُمَّتِىْ خَمْسَ خِصَالٍ فِىْ رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهُنَّ اُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا۔ وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ يُوْشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُوْنَ اَنْ يُّلْقُوْا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَيَصِيْرُوْا اِلَيْكَ وَتُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَخْلُصُوْا فِيْهِ اِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ اِلَيْهِ فِىْ غَيْرِهٖ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهٗ اِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ۔ رواه احمد والبزار والبيهقى ورواه ابوالشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب الا

ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری اُمت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی اُمتوں کو نہیں ملی ہیں (۱) یہ کہ اُن کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے (۲) یہ کہ ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دُعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ (۳) جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالےٰ شانہٗ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے (دنیا کی) مشقتیں اپنے اُوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں (۴) اس میں سرکش شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں اُن برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں (۵) رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا

ان عنده و تستغفر لهم الملائكة بدل الحيتان۔ كذا فى الترغيب)

کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے"

(২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতকে রমযান শরীফের ব্যাপারে পাঁচটি জিনিস বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে দান করা হয় নাই। ১. রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌কের ঘ্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। ২. তাহাদের জন্য নদীর মাছও দোয়া করে এবং ইফতার পর্যন্ত করিতে থাকে। ৩. প্রতিদিন তাহাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, অতিসত্বর আমার নেক বান্দারা নিজেদের উপর হইতে (দুনিয়ার) কষ্ট-ক্লেশ সরাইয়া তোমার কাছে আসিবে। ৪. এই মাসে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ফলে, অন্যান্য মাসে তাহারা যেই সমস্ত খারাপ কাজ পর্যন্ত পৌছিতে পারিত এই মাসে সেই পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। ৫. রমযানের সর্বশেষ রাত্রে রোযাদারদিগকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই রাত্র কি শবে কদর? উত্তরে বলিলেন, না, বরং নিয়ম হইল কাজ শেষ হইলে মজদুরকে তাহার মজদুরী দেওয়া হয়।

(তারগীব ঃ আহমদ, বাইহাকী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যেগুলি আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে এই উম্মতকে দান করিয়াছেন। পূর্ববর্তী উম্মতের রোযাদারদেরকে দেওয়া হয় নাই। আফসোস! আমরা যদি এই নেয়ামতের কদর করিতাম এবং ইহা হাসিল করিবার জন্য চেষ্টা করিতাম!

এক ঃ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ যাহা ক্ষুধা অবস্থায় সৃষ্টি হয় আল্লাহ তায়ালার কাছে মেশ্‌কে আম্বরের চাইতেও বেশী প্রিয়। হাদীস ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই কথাটির আটটি অর্থ হইতে পারে। সবকয়টিই আমি 'মুয়াত্তা' কিতাবের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। তবে আমি অধম (লেখক)-এর দৃষ্টিতে এইগুলির মধ্যে তিনটি অর্থ অগ্রগণ্য। একটি হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে এই দুর্গন্ধের বদলা ও সওয়াব এমন খুশবু দ্বারা দান করিবেন যাহা মেশকের চাইতেও অধিক উত্তম ও মস্তিষ্ক সতেজকারী হইবে। এই অর্থ একেবারেই স্পষ্ট এবং ইহা অসম্ভবও কিছু

নহে। তদুপরি 'দুররে মনছুর' কিতাবের এক হাদীসে ইহার স্পষ্ট বর্ণনাও রহিয়াছে। সুতরাং এই অর্থকে প্রায় নিশ্চিত বলা যায়।

দ্বিতীয়টি হইতেছে, কেয়ামতের দিন যখন কবর হইতে উঠিবে তখন এই আলামত হইবে যে, রোযাদারের মুখ হইতে এক প্রকার খুশবু বাহির হইবে যাহা মেশ্‌কে আম্বরের চাইতেও উত্তম হইবে।

তৃতীয়টি হইতেছে, দুনিয়াতেই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌কের চাইতে প্রিয়। অধমের মতে এই অর্থই সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়। ইহা মহব্বতের ব্যাপার। কেহ যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয় তবে তাহার দুর্গন্ধও নিজের কাছে হাজার খুশবুর তুলনায় অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়।

اے حافظ مسکین چہ کنی مشک ختن را
از گیسوئے احمد بستان عطر عدن را

অর্থাৎ হে অসহায় হাফেজ (কবির নাম)! তুমি খোতানের মেশক আনিয়া কি করিবে, আহমদের এলো কেশ শুঁকিয়া তুমি আদনের মন-মাতানো আতরের খুশবু ভোগ কর।

ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করিয়া আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইয়া যায়। রোযা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় এবাদত। এইজন্যই (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময় ফেরেশতারা দান করে আর রোযার বিনিময় আমি নিজে দান করি, কেননা ইহা একমাত্র আমারই জন্য। কোন বর্ণনায় হাদীসের শব্দ اُجْزِىْ بِهٖ বর্ণিত রহিয়াছে যাহার অর্থ 'আমি নিজেই রোযার বিনিময়'! স্বয়ং মাহবুব এবং প্রেমাস্পদই যদি লাভ হইয়া যায় তবে ইহার চাইতে উত্তম বদলা ও বিনিময় আর কি হইতে পারে?

এক হাদীসে আছে, সমস্ত এবাদতের দরজা হইল রোযা। অর্থাৎ রোযার কারণে দিল নূরানী ও আলোকিত হইয়া যায়, যাহার ফলে অন্যান্য এবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে ইহা তখনই হইবে যখন আসল ও খাঁটি রোযা হইবে। অর্থাৎ শুধু ক্ষুধার্ত থাকিলে হইবে না; বরং রোযার ঐ সমস্ত আদব ও নিয়ম পালন করিতে হইবে। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৯নং হাদীসে আসিতেছে।

এখানে একটি জরুরী মাসআলা বয়ান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা এই যে, উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন ইমাম রোযাদারকে বিকালের দিকে মিসওয়াক করিতে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে মুখের দুর্গন্ধ

দূর না হইয়া যায়। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়াক্তেই মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কেননা মিসওয়াক দ্বারা দাঁতের দুর্গন্ধ দূর হয়। আর হাদীসে যে দুর্গন্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা পাকস্থলী খালি হওয়ার কারণে হয়। ইহা দাঁতের দুর্গন্ধ নহে। সুতরাং রোযাদারের জন্য মিসওয়াক নিষিদ্ধ করার কোন যুক্তিগত কারণ নাই। হানাফীগণের দলীল হাদীস ও ফিকাহর কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, রোযাদারদের জন্য মাছ এস্তেগফার করে। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রোযাদারের জন্য দোয়া ও এস্তেগফারকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এস্তেগফার করে। আমার চাচাজান (অর্থাৎ, মাওলানা ইলিয়াস রহঃ) বলিয়াছেন, মাছের কথা বিশেষভাবে এইজন্য বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ অচিরেই (অর্থাৎ দুনিয়াতেই) তাহাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

(সূরা মারয়াম, আয়াত ঃ ৯৬)

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস। অতএব জিবরাঈল (আঃ) নিজে তাহাকে ভালবাসেন এবং আসমানে এই ঘোষণা দিয়া দেন যে, অমুক বান্দা আল্লাহর কাছে প্রিয় তোমরা সবাই তাহাকে ভালবাস। অতএব সমস্ত আসমানবাসী তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করে। এইভাবে জমীনেও তাহার মহব্বত ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তিকে তাহার আশেপাশের লোকেরাই মহব্বত করিয়া থাকে কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির মহব্বত ও জনপ্রিয়তা এতই ব্যাপক হইয়া যায় যে, শুধু আশেপাশের লোকেরাই নহে বরং পানিতে ও সাগর-নদীতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যেও তাহার প্রতি ভালবাসা পয়দা হইয়া যায়। অতএব উহারাও তাহার জন্য দোয়া করে। তাহার প্রতি মহব্বত এত ব্যাপক হয় যে, স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া পানি জগতে পৌঁছিয়া যায়, যাহা জনপ্রিয়তার সর্বশেষ স্তর। ইহাতে বনের প্রাণীরাও যে রোযাদারের জন্য দোয়া করে তাহাও বুঝে আসিয়া গেল।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। এই বিষয়টিও অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, বৎসরের শুরু হইতেই রমযানের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করার কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। আর সাধারণ নিয়মও ইহাই যে, যে ব্যক্তির আগমনের গুরুত্ব যত বেশী হয় সেই অনুপাতেই পূর্ব হইতে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা কয়েক মাস পূর্ব হইতেই শুরু করা হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, চরম দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানকে কয়েদ করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজে জোর কমিয়া যায়। যেহেতু রমযান মাস অধিক রহমত ও এবাদতের মাস, কাজেই এই মাসে শয়তানের অবিরাম চেষ্টা ও মেহনতের ফলে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজ সবচাইতে বেশী হওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তুলনামূলক গোনাহ খুব কম হইয়া থাকে। বহু শরাবী-কাবাবী লোক আছে যাহারা রমযান মাসে শরাব পান হইতে বিরত থাকে। এমনিভাবে স্পষ্ট দেখা যায় যে, অন্যান্য গোনাহও কমিয়া যায়। এতদসত্ত্বেও গোনাহ অবশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণে উল্লেখিত হাদীসে কোন প্রশ্ন দেখা দিবে না। কেননা, হাদীসে বলা হইয়াছে চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানকে কয়েদ করা হয়। অতএব সাধারণ শয়তান কয়েদমুক্ত থাকিয়া গোনাহের কাজে লিপ্ত করে ; তাই কোন প্রশ্ন থাকে না। অবশ্য অন্যান্য হাদীসে 'চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী' শব্দটির উল্লেখ না করিয়া শুধু শয়তানের কথা বলা হইয়াছে। যদি এই সকল হাদীস দ্বারাও চরম অবাধ্য ও বিদ্রোহী শয়তানই উদ্দেশ্য হয় তবে তো আর কোন প্রশ্ন থাকিল না। কারণ অনেক সময় অতিরিক্ত অর্থবোধক শব্দ উল্লেখ না করিলেও অপরাপর হাদীস দ্বারা তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যায়। আর যদি এই সকল হাদীস দ্বারা সব ধরনের শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ করার কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় তবুও গোনাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ প্রশ্ন ও জটিলতা থাকিবে না। কেননা গোনাহ যদিও সাধারণতঃ শয়তানের ধোকার কারণে হইয়া থাকে কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর শয়তানের সহিত মেলামেশা এবং তাহার বিষক্রিয়া ছড়াইয়া যাওয়ার কারণে নফসের সম্পর্ক শয়তানের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া যায় যে, এখন কিছুক্ষণের জন্য শয়তানের অনুপস্থিতি অনুভূত হয় না, বরং শয়তানী খেয়াল স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। তাই দেখা যায় রমযান ছাড়া অন্য সময় যাহাদের দ্বারা গোনাহের কাজ বেশী হয় রমযান মাসে তাহাদের দ্বারাই বেশী হয়—নফস যেহেতু সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকে তাই উহার প্রভাবও সর্বদা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যখন কোন গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। ইহার পর যদি সে খাঁটি তওবা করে তবে ঐ দাগ দূর হইয়া যায় নতুবা উহা লাগিয়াই থাকে। পুনরায় যদি গোনাহ করে তবে অনুরূপ আরেকটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে দাগ পড়িতে পড়িতে তাহার অন্তর সম্পূর্ণ কালো হইয়া যায়। অতঃপর ভাল কথা তাহার অন্তরে স্থান পায় না। ইহাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমের এই আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন— كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত অন্তর গোনাহের দিকে নিজেই ধাবিত হয়। এই কারণেই বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা কোন এক ধরনের গোনাহ নির্দ্বিধায় করিয়া ফেলে কিন্তু ঐ ধরনেরই অন্য কোন গোনাহ যখন সম্মুখে আসে তখন অন্তর তাহা করিতে রাজি হয় না। যেমন, শরাবখোরকে যদি শূকরের গোশত খাইতে বলা হয় তবে সে খাইতে চাহিবে না। অথচ গোনাহের দিক হইতে উভয়টি সমান। অনুরূপভাবে রমযান ছাড়া অন্য সময় যখন গোনাহ করিতে থাকে তখন তাহাদের অন্তর উক্ত গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অতঃপর রমযান আসার পর আর শয়তানের প্রয়োজন হয় না ; এমনিতেই গোনাহ হইতে থাকে।

মোটকথা, হাদীস দ্বারা যদি সবধরনের শয়তানকে কয়েদ ও আবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয় তবু রমযান মাসে গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের কারণ থাকে না। আর যদি শুধু চরম দুষ্ট ও বিদ্রোহী শয়তানকে আবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয় তবে তো কোন প্রশ্ন থাকেই না। অধমের খেয়ালে এই ব্যাখাই উত্তম।

যে কোন লোক চিন্তা করিতে পারে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে যে, অন্য মাসে নেক কাজ করার জন্য এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যতটুকু জোর লাগাইতে হয় রমযান মাসে ততটুকু করিতে হয় না। বরং সামান্য একটু হিম্মত করিলে এবং খেয়াল করিলেই যথেষ্ট হইয়া যায়।

হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ)–এর অভিমত হইল, হাদীস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে আসিয়াছে। ফাসেক ও গোনাহগারদের জন্য শুধু দুষ্ট শয়তানদিগকে আবদ্ধ করা হয় আর নেককারদের জন্য সবধরণের শয়তানকেই আবদ্ধ করা হয়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রমযানের সর্ব শেষ রাত্রে রোযাদারদিগকে

মাফ করিয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়টি প্রথম হাদীসেও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু রমযান মাসে শবে কদর সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্র তাই সাহাবায়ে কেরামের মনে এই খেয়াল উদয় হইয়াছে যে, এত বড় ফযীলত তো শবে কদরের জন্যই হইতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ফযীলত, যাহা রমযান শেষ হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে।

(٣) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقٰى دَرَجَةً قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَاكُنَّا نَسْمَعُهٗ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بُعْدًا مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهٗ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بُعْدًا مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بُعْدًا مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهٗ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ اٰمِيْنَ - (رواه الحاكم و قال صحيح الاسناد كذا فى الترغيب وقال السخاوى رواه ابن حبان فى ثقاته وصححه والطبرانى فى الكبير والبخارى فى بر الوالدين له والبيهقى فى الشعب وغيرهم ورجاله ثقات و

كعبؓ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضورؐ نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اُترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سُنی جو پہلے کبھی نہیں سُنی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسوقت جبرئیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو) اُنہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اسکی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپکا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں

بسط طرقه وروى الترمذى عن ابى هريرة بمعناه وقال ابن حجر طرقه كثيرة كما فى المرقاة)

داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔

(৩) হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা মিম্বরের কাছে আসিয়া যাও। আমরা মিম্বরের কাছে আসিয়া গেলাম। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখন বলিলেন, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন তখনও বলিলেন, আমীন। যখন তিনি খুৎবা ও বয়ান শেষ করিয়া মিম্বর হইতে নামিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে মিম্বরে উঠিবার সময় এমন কিছু কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা পূর্বে কখনও শুনি নাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে রমযানের মোবারক মাস পাইল তাহার গোনাহ মাফ হইল না। আমি বলিলাম, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্তু সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়ে না। আমি বলিলাম, আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল কিন্তু তাহারা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম, আমীন। (তারগীব ঃ হাকিম, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, বাইহাকী ঃ শু'আব, বুখারী ঃ বিররুল ওয়ালিদাইন নামক কিতাব)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তিনটি বদদোয়া করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটি বদদোয়ার উপর আমীন বলিয়াছেন।। প্রথমতঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর মত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার বদদোয়াই যথেষ্ট ছিল তারপর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীন ইহার সহিত যোগ হইয়া আরও কত কঠিন বানাইয়া দিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই তিন জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকার তওফীক দান করুন এবং এই সমস্ত গোনাহ হইতে রক্ষা করুন ; নচেৎ ধ্বংসের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে।

'দুররে মানসূর' নামক কিতাবের কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমীন বলার জন্য বলিয়াছেন অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে এই বদদোয়া সম্পর্কে আরো বেশী গুরুত্ব বুঝা যায়।

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যাহার উপর রমযানের মুবারক মাস অতিবাহিত হইয়া যায় কিন্তু তাহার গোনাহ মাফ হয় না। অর্থাৎ রমযান মোবারক এত বরকত ও কল্যাণের মাস, যে মাসে মাগফেরাত ও আল্লাহর রহমত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকে, এমন মাসও গোনাহ ও গাফলতির মধ্য কাটিয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তির রমযান মাস এইভাবে কাটিয়া যায় যে, নিজের বদআমলী ও ত্রুটির কারণে মাগফেরাত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায় তবে আর কোন্ সময়টি তাহার মাগফেরাতের জন্য হইবে? এবং তাহার ধ্বংসের ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? মাগফেরাতের পন্থা হইল, এই মাসে যে সমস্ত আমল রহিয়াছে, যেমন রোযা, তারাবীহ এইগুলি অত্যন্ত এহতেমামের সাথে আদায় করার পর স্বীয় গোনাহ হইতে বেশী বেশী তওবা ও এস্তেগফার করা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহার জন্য বদদোয়া করা হইয়াছে সে হইল যাহার সম্মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দুরূদ পড়ে না। এই বিষয়টি আরো অনেক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তাই কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হয় তখনই শ্রবণকারীদের উপর দুরূদ পড়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর দুরূদ পড়ে না তাহার ব্যাপারে আরো বহু ধমকি ও হুঁশিয়ারীর কথা উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরও অনেক হাদীসে আসিয়াছে। কোন কোন হাদীসে এইরূপ ব্যক্তিকে অত্যন্ত হতভাগা ও বখীল বলা হইয়াছে। কোথাও তাহাকে জালেম ও জান্নাতের রাস্তাহারা বলা হইয়াছে। এমনকি তাহাকে বদদ্বীন ও জাহান্নামে প্রবেশকারীও বলা হইয়াছে। এমনও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখিতে পাইবে না। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম যদিও এই সমস্ত রেওয়ায়াতের সহজ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তবুও এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, যে ব্যক্তি দুরূদ পড়ে না তাহার সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদসমূহের বাহ্যিক এতই কঠিন যাহা সহ্য করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

আর এইরূপ কেনই বা হইবে না? উম্মতের উপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহসান ও অনুগ্রহ এতই অপরিসীম যাহা লিখায় ও কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহাছাড়া উম্মতের উপর তাঁহার হক ও অধিকার এত বেশী যে, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দুরূদ বর্জনকারী সম্বন্ধে যে কোন ধমকি ও হুঁশিয়ারী যথার্থই মনে হয়। কেবল দুরূদ শরীফ পড়ার যে ফযীলত রহিয়াছে তাহা হইতে মাহরূম থাকাই স্বতন্ত্র একটা বদনসীবি ও দুর্ভাগ্য। ইহার চাইতে বড় ফযীলত আর কি হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহতায়ালা তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। তদুপরি ফেরেশতাদের দোয়া, গোনাহ মাফ হওয়া, দরজা বুলন্দ হওয়া, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব লাভ হওয়া, শাফাআত ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি অতিরিক্ত। ইহা ছাড়াও বিশেষ সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করার দরুন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তাঁহার গজব হইতে মুক্তিলাভ, কেয়ামতের বিভীষিকা হইতে নাজাত লাভ, মৃত্যুর আগেই জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখা ইত্যাদি বিষয়ের ওয়াদাও রহিয়াছে। এইসব কিছু ছাড়াও দুরূদ শরীফ পড়িলে দারিদ্র ও অভাব দূর হয়, আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে নৈকট্য লাভ হয়, দুশমনের মোকাবিলায় সাহায্য লাভ হয়, অন্তর মোনাফেকী ও মরিচামুক্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে তাহার ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়া সম্বন্ধে হাদীস শরীফে আরো অনেক সুসংবাদ রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরজ এবং এই ব্যাপারে সকল মাযহাবের ওলামাগণ একমত। অবশ্য বার বার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হইলে প্রত্যেক বার দরুদ পড়া ওয়াজিব কি না এই ব্যাপারে দ্বিমত রহিয়াছে। কতকের মতে ওয়াজিব আর কতকের মতে মুস্তাহাব।

তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল কিন্তু তাহাদের এই পরিমাণ খেদমত করিল না যাহা দ্বারা সে জান্নাতের উপযুক্ত হইতে পারে। পিতামাতার হকের ব্যাপারে বহু হাদীসে তাকিদ আসিয়াছে। ওলামায়ে কেরাম পিতামাতার হক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, জায়েয বিষয়ে তাহাদের কথা মানা জরুরী। ইহাও লিখিয়াছেন, পিতামাতার সহিত বেআদবী করিবে না, তাহাদের সহিত অহঙ্কার করিবে না, যদিও তাহারা মুশরেক হয়। নিজের আওয়াজ তাহাদের আওয়াজের চাইতে বড় করিবে না, তাহাদের নাম ধরিয়া

ডাকিবে না, কোন কাজে তাহাদের চেয়ে আগে বাড়িবে না, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধের ক্ষেত্রেও তাহাদের সহিত নম্রতা অবলম্বন করিবে। যদি তাহারা না মানে তবে সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করিতে থাকিবে। মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখিবে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দরজা হইতেছে পিতা। তোমার মন চাহিলে উহাকে হেফাজত করিতে পার অথবা উহাকে নষ্ট করিতে পার। জনৈক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামাতার হক কি? তিনি বলিলেন, তাহারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টি জান্নাত আর তাহাদের অসন্তুষ্টি জাহান্নাম। এক হাদীসে আছে, বাধ্যগত ছেলে যদি মহব্বতের দৃষ্টিতে পিতামাতার দিকে একবার তাকায় তবে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ হইবে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা শির্কের গোনাহ ছাড়া যত ইচ্ছা মাফ করেন কিন্তু পিতামাতার নাফরমানী ও অবাধ্যতার সাজা মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে দিয়া দেন।

জনৈক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? উত্তরে বলিলেন, জ্বি হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার খেদমত কর ; তাহার পায়ের নীচে তোমার জান্নাত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ ছাড়া আরো বহু হাদীসে পিতামাতার আনুগত্য ও খেদমতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যাহারা গাফিলতি করিয়া এইসব বিষয়ে ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্তমানে তাহাদের পিতামাতা জীবিত নাই এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়তে ইহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, কাহারো পিতামাতা যদি এমতাবস্থায় মারা গিয়া থাকে যে, সে তাহাদের অবাধ্যতা করিত, তবে তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া ও এস্তেগফার করিলে সে বাধ্যগত বলিয়া গণ্য হইবে। আরেক হাদীসে আছে, উত্তম সদ্ব্যবহার হইল পিতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার করা।

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا قَدْ حَضَرَكُمْ رَمَضَانُ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ وَيُبَاهِيْ بِكُمْ مَلٰٓئِكَتَهٗ فَاَرُوا اللّٰهَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ خَيْرًا فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. (رواه الطبرانى ورواته ثقات الا ان محمد بن قيس لا يحضرنى فيه جرح ولا تعديل كذا فى الترغيب)

حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہٗ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔

(৪) হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রমযান মাসের নিকটবর্তী সময়ে একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, রমযানের মাস আসিয়া গিয়াছে। যাহা অতি বরকতের মাস। এই মাসে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন, বিশেষ রহমত নাযিল করেন, গোনাহ মাফ করেন এবং দোয়া কবুল করেন। তোমাদের তানাফুসকে (অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা) দেখেন এবং ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে তোমাদের নেক কাজ দেখাও। ঐ ব্যক্তি বড়ই হতভাগা যে এইমাসেও আল্লাহর রহমত হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ 'তানাফুস' শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় বেশী করার আগ্রহ লইয়া কাজ করা। যাহারা গর্ব ও প্রতিযোগিতা করিতে চায় তাহারা এই ক্ষেত্রে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাক। আমি গর্বস্বরূপ নহে বরং নেয়ামতের প্রকাশ ও শোকরিয়া স্বরূপ বলিতেছি, নিজের অযোগ্যতার কারণে যদিও কিছু করিতে পারি না কিন্তু আমার ঘরের মহিলাদের অবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হই যে, তাহাদের অধিকাংশই তেলাওয়াতের ব্যাপারে একে অপরের তুলনায় আগে বাড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে। ঘরের কাজকর্ম সত্ত্বেও দৈনিক ১৫/২০ পারা সহজে পড়িয়া নেয়। আল্লাহ তায়ালা

দয়া করিয়া এইটুকু কবুল করিয়া নিন এবং আরো বেশী আমল করিবার তওফীক দান করুন।

(٥) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عُتَقَاءَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَاِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. (رواه البزار كذا فى الترغيب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے (جہنم کے) قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রমযান মাসের প্রতি দিবারাত্রে আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে (জাহান্নামের) কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রতি দিবারাত্রে প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া অবশ্যই কবুল করা হয়। (তারগীব ঃ বায্যার)

ফায়দা ঃ বহু হাদীসে রোযাদারের দোয়া কবুল হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমরা ঐ সময় এইভাবে খাওয়ার পিছনে পড়ি যে, অন্য দোয়া করার সুযোগ তো দূরের কথা খোদ ইফতারের দোয়াই মনে থাকে না। ইফতারের প্রসিদ্ধ দোয়া এই—

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোযা রাখিয়াছি, আপনার প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, আপনার উপরই ভরসা করিয়াছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করিতেছি।

হাদীসের কিতাবসমূহে এই দোয়াটি সংক্ষিপ্তভাবেই পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাযিঃ) ইফতারের সময় এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে স্বীয় গোনাহমাফীর দরখাস্ত করিতেছি, আপনার ঐ রহমতের ওসীলায় যাহা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে।

কোন কোন কিতাবে স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই দোয়া বর্ণিত আছে—

يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ হে সুপ্রশস্ত অনুগ্রহের মালিক! আমাকে মাফ করুন।

আরো অন্যান্য দোয়াও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশেষ কোন দোয়াই পড়িতে হইবে এমন নহে। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার সময়। অতএব আপন প্রয়োজন অনুসারে দোয়া করিবেন। আর স্মরণ হইলে এই গোনাহগারকেও দোয়ায় শরীক করিয়া লইবেন, কেননা আমি একজন সওয়ালকারী। আর সওয়ালকারীর হক রহিয়াছে। (কবির ভাষায়—)

چشمۂ فیض سے گر ایک اشارا ہو جائے لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے

অর্থ ঃ আপনার দয়ার ভাণ্ডার হইতে যদি একটু ইশারা হইয়া যায় তবে আমি দয়াপ্রাপ্ত হইব। আপনার একটু মেহেরবানী হইল আর আমার কাজ হইয়া গেল।

(৭) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِيْ لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ۔

(رواه احمد فی حدیث والترمذی و حسنه وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحهما كذا فی الترغیب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہٗ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے۔

(৬) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। এক. ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া। দুই. ন্যায়বিচারক বাদশাহের দোয়া। তিন. মাজলুম ব্যক্তির দোয়া ; আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া মেঘের উপর উঠাইয়া লন। আসমানের সকল দরজা উহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই

তোমার সাহায্য করিব। যদিও (কোন মঙ্গলের কারণে)কিছুটা বিলম্ব ঘটে।

ফায়দা ঃ 'দুররে মানসূর' কিতাবে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযান মাস আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা বদলাইয়া যাইত। তাঁহার নামাযের পরিমাণ বাড়িয়া যাইত এবং দোয়ার মধ্যে খুবই কাকুতি-মিনতি করিতেন। আল্লাহর ভয় ও ভীতি বৃদ্ধি পাইয়া যাইত। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) অন্য এক রেওয়ায়াতে বলেন, রমযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বিছানায় আসিতেন না।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ পাক রমযান মাসে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন যে, তোমরা নিজ নিজ এবাদত-বন্দেগী ছাড়িয়া রোযাদারদের দোয়ার সাথে সাথে আমীন বলিতে থাক। বহু হাদীস দ্বারা রমযানের দোয়া বিশেষভাবে কবূল হওয়ার কথা জানা যায়। আর ইহা নিশ্চিত কথা যে, রমযানে দোয়া কবূল করার ব্যাপারে যখন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে এবং তাঁহার সত্য রাসূল উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন এই ওয়াদা পূরণ হইবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, কেহ কোন উদ্দেশ্য নিয়া দোয়া করিয়া থাকে অথচ তাহার দোয়ায় কোন কাজ হয় না। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাহার দোয়া কবূল হয় নাই। বরং দোয়া কবূল হওয়ার অর্থ বুঝিয়া লওয়া দরকার।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ বা কোন পাপকাজ ব্যতীত কোন দোয়া করে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে তিনটি বিষয়ের কোন একটি অবশ্যই পাইয়া থাকে। হয়তো সে যে বিষয়ে দোয়া করিয়াছে যথাযথ উহাই পাইয়া যায়। অথবা উহার পরিবর্তে তাহার উপর হইতে কোন মুসীবত দূর করিয়া দেওয়া হয়। অথবা ঐ পরিমাণ সওয়াব আখেরাতে তাহার আমলনামায় লিখিয়া দেওয়া হয়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে দোয়া করার হুকুম দিয়াছিলাম এবং উহা কবূল করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। তুমি কি আমার নিকট দোয়া করিয়াছিলে? বান্দা আরজ করিবে, দোয়া করিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইবেন, তুমি এমন কোন দোয়া কর নাই যাহা আমি কবূল করি নাই। তুমি দোয়া করিয়াছিলে যে, তোমার অমুক কষ্ট ও অসুবিধা দূর হইয়া যাক। আমি দুনিয়াতে উহা দূর করিয়া দিয়াছিলাম। তুমি অমুক পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য দোয়া

করিয়াছিলে। কিন্তু উহা কবূল হওয়ার কোন আলামত তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি উহার পরিবর্তে তোমার জন্য এই পরিমাণ সওয়াব ও প্রতিদান নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, এইভাবে তাহাকে প্রত্যেকটি দোয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে এবং উহার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি দুনিয়াতে পুরা হইয়াছে আর কোন্ কোন্‌টির জন্য আখেরাতে কি পরিমাণ বদলা ও প্রতিদান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিয়া দেওয়া হইবে। তখন বান্দা এত বেশী সওয়াব ও প্রতিদান দেখিয়া আফসোস করিয়া বলিবে যে, হায়! দুনিয়াতে যদি তাহার একটি দোয়াও পূরণ না হইত! মোটকথা, দোয়া নেহায়েত আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোয়ার ব্যাপারে গাফলতি ও উদাসীনতা মারাত্মক লোকসান ও ক্ষতির কারণ। যদি জাহেরীভাবে দোয়া কবূল হওয়ার আলামত না দেখা যায়, তবু নিরাশ হইতে নাই।

এই কিতাবের শেষ দিকে যে দীর্ঘ হাদীস আসিতেছে উহা দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বান্দার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বান্দা যাহা চাহিয়াছে উহা যদি তাহার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তিনি উহা দিয়া দেন, আর যদি উহা তাহার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে তিনি তাহা দেন না। ইহাও আল্লাহ তায়ালার এক বড় অনুগ্রহ। কেননা অনেক সময় আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এমন জিনিসের দোয়া করিয়া থাকি যাহা আমাদের জন্য মুনাসিব ও সংগত নয়। আরও একটি জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, অনেক পুরুষ এবং বিশেষ করিয়া মহিলারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে যে, প্রায় সময়েই তাহারা রাগ-গোস্বা ও ক্ষোভে-দুঃখে নিজের সন্তান ইত্যাদিকে বদদোয়া দিয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার সুমহান দরবারে এমন কিছু বিশেষ সময় রহিয়াছে যে, তখন যাহা চাওয়া হয় তাহাই কবূল হইয়া যায়। অতএব এই আহমক রাগ-গোস্বায় প্রথমে তো নিজের সন্তানের জন্য বদদোয়া করে, আর যখন সন্তান মরিয়া যায় বা কোন বিপদে পড়িয়া যায় তখন সে কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ ইহা চিন্তাও করে না যে, এই মুসীবত তো সে নিজেই বদদোয়া করিয়া চাহিয়া লইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজের উপর, নিজের সন্তানের উপর এমনকি নিজের মাল-সম্পদ ও খাদেমদের উপর বদদোয়া করিও না। হয়তো তোমার এই বদ-দোয়া কোন খাছ কবুলিয়াতের সময়ে হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রমযানুল মোবারকের পুরাটা মাসই হইল দোয়া

কবূলের মাস। এই সময়ে কোন বদদোয়া করা হইতে খুবই সতর্কতার সহিত বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রমযান মাসে আল্লাহর স্মরণকারী ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মাসে আল্লাহর নিকট দোয়াকারী ব্যক্তি ব্যর্থ হয় না।

'তারগীব' কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, রমযানের প্রত্যেক রাত্রে একজন আহবানকারী ফেরেশতা ডাকিয়া বলিতে থাকে যে, হে নেকী অন্বেষণকারী! নেককাজে মনোযোগ দাও এবং অগ্রসর হও। হে পাপাচারী! ক্ষান্ত হও, চোখ খুলিয়া দেখ! অতঃপর সেই ফেরেশতা আবার ঘোষণা করিতে থাকে যে, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী যাহাকে ক্ষমা করা হইবে! কে আছ তওবাকারী যাহার তওবা কবূল করা হইবে! কে আছ দোয়াকারী যাহার দোয়া কবূল করা হইবে! কে আছ সওয়ালকারী যাহার সওয়াল পূরণ করা হইবে!

উপরোক্ত আলোচনার পর এই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীস শরীফে দোয়া কবূল হওয়ার জন্য কিছু শর্তও বর্ণিত হইয়াছে। এই শর্তগুলি পাওয়া না গেলে অনেক সময়ই দোয়া কবূল হয় না। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি হইল খাদ্য হালাল হইতে হইবে। কেননা, হারাম খাদ্যের কারণেও দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, বহু দুর্দশাগ্রস্ত লোক আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে থাকে এবং ইয়া রব ইয়া রব বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অথচ তাহার খানাপিনা হারাম, লেবাস-পোশাক হারাম। এমতাবস্থায় তাহার দোয়া কিভাবে কবূল হইবে?

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, কুফা নগরীতে এক জামাত ছিল যাহাদের দোয়া কবূল হইত। যখনই কোন শাসনকর্তা তাহাদের উপর জুলুম করিত তখন তাহারা বদদোয়া করিতেন ফলে সেই শাসনকর্তা ধ্বংস হইয়া যাইত। জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ গভর্নর নিযুক্ত হইলে সে একদিন দাওয়াতের আয়োজন করিল। এই অনুষ্ঠানে উপরোল্লিখিত আল্লাহওয়ালাদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত করিয়া আনিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর হাজ্জাজ বলিয়া উঠিল যে, আমি এই সকল বুযুর্গ লোকদের বদদোয়া হইতে নিরাপদ হইয়া গেলাম। কেননা তাহাদের পেটে হারাম খাদ্য ঢুকিয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের যমানায়

হালাল রুজির বিষয়ে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন যেখানে সর্বদাই সুদকে পর্যন্ত হালাল করিবার চেষ্টা চলিতেছে, চাকরীজীবীগণ ঘুষ গ্রহণকে এবং ব্যবসায়ীগণ ধোকা–প্রবঞ্চনাকে উত্তম মনে করিতেছে।

(৭) عَنِ ابْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ. (رواه الطبرانى فى الاوسط و ابن حبان فى صحيحه كذا فى الترغيب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہٗ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔

(৭) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এবং তাহার ফেরেশতাগণ সেহরী খানেওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন।

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার কত বড় পুরস্কার ও অনুগ্রহ যে, রোযা শুরু করিবার পূর্বের খানা যাহাকে সেহরী বলা হয় রোযার বরকতে উহাকেও তিনি উম্মতের জন্য সওয়াবের বিষয় বানাইয়া দিয়াছেন এবং উহাতেও মুসলমানদেরকে নেকী ও সওয়াব দিয়া থাকেন। বহু হাদীসে সেহরী খাওয়ার ফযীলত ও উহার সওয়াবের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন, আল্লামা আইনী (রহঃ) সতরজন সাহাবায়ে কেরাম হইতে সেহরীর ফযীলত সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার উপর উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। অলসতার দরুন অনেকেই এই ফযীলত হইতে মাহরূম থাকিয়া যায়। আবার কেহ কেহ তারাবীর নামাযের পর খানা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং সে উহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকে। কেননা, অভিধানে সেহরী বলা হয় ঐ খানাকে যাহা সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খাওয়া হয়। যেমন 'আল–কামূস' নামক অভিধান গ্রন্থে ইহাই লেখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, অর্ধরাত হইতেই সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত শুরু হইয়া যায়। 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থের লেখক রাত্রের শেষ ষষ্ঠাংশকে সেহরীর ওয়াক্ত বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত রাত্রকে ছয় ভাগে ভাগ করিবার পর শেষ অংশকে সেহরী বলে। যেমন সূর্যাস্ত হইতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যদি বার ঘন্টা হয় তবে শেষ দুই ঘন্টা হইবে সেহরী খাওয়ার ওয়াক্ত। আর এই দুই ঘন্টার মধ্যেও শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া উত্তম। তবে শর্ত হইল, এত দেরী যেন না হয় যে, রোযার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও বহু হাদীসে সেহরীর ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাদের এবং ইয়াহুদ–নাসারাদের রোযার মধ্যে সেহরী খাওয়ার দ্বারাই পার্থক্য হইয়া থাকে। কেননা তাহারা সেহরী খায় না। অন্য এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সেহরী খাও, কেননা ইহাতে বরকত রহিয়াছে। আরেক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রহিয়াছে—১. জামাত, ২. ছারীদ ও ৩. সেহরী খাওয়ার মধ্যে। এই হাদীসে জামাত শব্দটি ব্যাপক অর্থে আসিয়াছে। নামাযের জামাত হউক বা প্রত্যেক ঐ কাজ যাহা মুসলমানগণ জামাতবদ্ধ হইয়া করিয়া থাকে। এই জামাতের সহিত আল্লাহর সাহায্য রহিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে। ছারীদ বলা হয় গোশত ও রুটি দ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার খাদ্যকে, যাহা খুবই সুস্বাদু হইয়া থাকে। তৃতীয় হইল সেহরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে নিজের সহিত সেহরী খাওয়ার জন্য ডাকিতেন তখন এইরূপ এরশাদ করিতেন যে, আস! বরকতের খানা খাও। এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন যে, সেহরী খাইয়া রোযার জন্য শক্তি হাসিল কর এবং দুপুরে ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে উঠিবার ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ কর।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযিঃ) এক সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এমন এক সময়ে হাজির হইলাম যে, তখন তিনি সেহরী খাইতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা একটি বরকতের জিনিস, যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন ; ইহা কখনও ছাড়িও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সেহরীর খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন। এমনকি তিনি এইরূপও এরশাদ করিয়াছেন যে, আর যদি কিছু নাও খাইতে পার তবে অন্ততঃ একটি খেজুর হইলেও খাইয়া লও অথবা এক ঢোক পানি হইলেও পান করিয়া লইও। কেননা ইহাতে রোযাদারের যেমন পেট ভরে তেমনি সওয়াবও হয়। কাজেই বিশেষভাবে এই খানার এহ্‌তেমাম করা চাই। কারণ, উহাতে নিজেরই আরাম এবং নিজেরই ফায়দা এবং বিনা কষ্টে সওয়াবও পাওয়া যায়। তবে এতটুকু অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সব কাজে অতিমাত্রা ও অতি কম উভয়ই ক্ষতিকর। তাই এত কম খাইবে না যে, এবাদত–বন্দেগীতে দুর্বলতা অনুভব হয়। আর এত বেশীও খাইবে না যে, সারাদিন চুকা ঢেকুর আসিতে থাকে। 'একটি খেজুর বা এক ঢোক পানির

কথা' বলিয়া উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্যান্য হাদীসেও বেশী খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আসিয়াছে। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেহরীর বরকত বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে। যেমন ইহাতে সুন্নতের অনুসরণ করা হয় এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরোধিতা করা হয়। কেননা তাহারা সেহরী খায় না। আর আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের বিরোধিতা করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও সেহরী খাওয়ার দ্বারা এবাদতে শক্তি লাভ হয় এবং অধিক একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত অতিমাত্রায় ক্ষুধার কারণে অনেক সময় মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, সেহরী খাওয়ার দ্বারা ইহারও প্রতিরোধ হয়। সেহরী খাওয়ার সময় যদি কোন অভাবী লোক আসিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্য করা যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ফকীর বা গরীব মানুষ থাকিলে তাহারও সাহায্য করা যায়। সর্বোপরি ইহা বিশেষভাবে দোয়া কবূল হওয়ার সময়। সেহরীর বদৌলতে এই সময় দোয়া ও যিকিরের তওফীক হয়। ইহা ছাড়াও সেহরীর আরও অনেক উপকারিতা রহিয়াছে।

ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন, সূফী-সাধকগণের মধ্যে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, ইহা রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত ; কেননা রোযার উদ্দেশ্য হইল পেট ও লজ্জাস্থানের খাহেশকে দুর্বল করিয়া দেওয়া। অথচ সেহরী এই উদ্দেশ্যের খেলাফ। কিন্তু সহীহ কথা এই যে, সেহরী এতবেশী পরিমাণে খাওয়া যাহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় ইহা তো ভাল নয়। ইহা ছাড়া খাওয়ার পরিমাণ অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। অধমের নাকেস খেয়ালেও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত অভিমত ইহাই যে, সেহরী ও ইফতার কম খাওয়াই উত্তম। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী উহাতে ব্যতিক্রম হইয়া যায়। যেমন, তালেবে এলেমদের জন্য খানার পরিমাণ কম করিলে রোযার উপকারিতা হাসিল হইবে বটে কিন্তু তাহাদের এলেম হাসিলের মধ্যে ক্ষতি হইবে। তাই তাহাদের জন্য উত্তম হইল যে, তাহারা কম খাইবে না। কেননা শরীয়তে ইলমেদ্বীন হাসিল করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এমনিভাবে জাকেরীনদের জামাত ও অন্যান্য জামাত যাহারা কম খাওয়ার কারণে কোন দ্বীনি কাজে গুরুত্ব সহকারে মশগুল হইতে পারিবে না, তাহাদের জন্যও কম না খাওয়াই উত্তম।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জিহাদে

যাওয়ার সময় ঘোষণা করেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখার মধ্যে নেকী নাই। অথচ তখন রমযানের রোযা ছিল। কিন্তু সেখানে জিহাদের প্রয়োজন সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য রোযার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজে যদি দুর্বল হইবার আশংকা না থাকে, তবে খানার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়াই উত্তম।

'শরহে ইকনা' কিতাবে আল্লামা শা'রানী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'আমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে যে, পেট ভরিয়া খানা খাইব না ; বিশেষ করিয়া রমযানের রাত্রসমূহে।' অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে খানা কমাইয়া দেওয়াই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি ইফতার ও সেহরীর সময় পেট ভরিয়া খাইল তাহার রোযার দ্বারা কি ফায়দা হইল। মাশায়েখগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ভুকা থাকিবে, আগামী রমযান পর্যন্ত এক বৎসর শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে। আরও অনেক বুযুর্গ মাশায়েখ হইতেও এই ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম বর্ণিত হইয়াছে।

'এহয়াউল উলূম' কিতাবের ব্যাখ্যায় 'আওয়ারিফ' কিতাবের বরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তারী (রহঃ) পনর দিনে একবার খানা খাইতেন আর রমযান মাসে মাত্র এক লোকমা খানা খাইতেন। অবশ্য সুন্নতের উপর আমল করিবার জন্য প্রতিদিন শুধু পানি দ্বারা ইফতার করিতেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন ; তবে (আল্লাহওয়ালা) বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে কেহ আসিলে রোযা খুলিতেন এবং বলিতেন, এইরূপ বন্ধু-বান্ধবদের সহিত খাওয়া-দাওয়া করার ফযীলত রোযার ফযীলত হইতে কোনপ্রকার কম নয়। আরও অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের হাজারো ঘটনা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাহারা খানা কমাইয়া দিয়া নিজেদের নফসকে শায়েস্তা করিতেন। কিন্তু শর্ত ইহাই যে, এই কারণে যেন দ্বীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষতি না হইয়া যায়।

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهَرُ۔

(رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائى)

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ اُن کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ اُن کو رات کے جاگنے (کی مشقت) کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔

وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال على شرط البخارى ذكر لفظهما المنذرى فى الترغيب بمعناه)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন আছে, যাহাদের রোযার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আবার অনেক রাত্রি জাগরণকারী এমন আছে, যাহাদের রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত আছে। এক ঃ ইহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে সারাদিন রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে ; রোযা রাখার দ্বারা যে পরিমাণ সওয়াব হইয়াছিল হারাম মাল খাওয়ার গোনাহ উহা হইতে বেশী হইয়া গেল। সুতরাং দিনভর শুধু অনাহারে থাকা ছাড়া তাহার আর কোন লাভ হইল না।

দ্বিতীয় অভিমত হইল, ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা রাখে ; কিন্তু গীবত–শেকায়েত অর্থাৎ অন্যের দোষ–চর্চায় লিপ্ত থাকে। ইহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

তৃতীয় অভিমত হইল, ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যে রোযা রাখিয়াও গোনাহ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ ও বাণীসমূহ খুবই ব্যাপক ও বহুল অর্থবিশিষ্ট হয় ; এইসব অভিমত এবং আরও অন্যান্য অভিমতও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এমনিভাবে রাত্রি জাগরণের অবস্থা। সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইল ; কিন্তু আমোদ–ফুর্তির জন্য একটু গীবত করিল কিংবা অন্য কোন আহাম্মকী কাজ করিল, যাহাতে তাহার সমস্ত রাত্রি–জাগরণ বেকার হইয়া গেল। যেমন ফজরের নামাযই কাজা করিয়া দিল অথবা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য বা সুনাম অর্জনের জন্য রাত্রি–জাগরণ করিল ফলে উহা বেকার হইল।

(৯) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لئے ڈھال ہے جب تک اُس کو پھاڑ نہ ڈالے۔

(رواه النسائى وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه على شرط البخارى والفاظهم مختلفة حكاها المنذرى فى الترغيب)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ উহাকে ফাড়িয়া না ফেলে।

ফায়দা ঃ ঢাল হইবার অর্থ হইল, মানুষ যেভাবে ঢাল দ্বারা নিজের হেফাজত করে ঠিক তেমনিভাবে রোযার দ্বারাও নিজের দুশমন অর্থাৎ শয়তান হইতে আত্মরক্ষা হয়। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, রোযা আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা করে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রোযা জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া রাখে। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোযা কোন্ জিনিসের দ্বারা ফাড়িয়া যায়? তিনি ফরমাইলেন, মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা। উপরোক্ত দুইটি রেওয়ায়াত এবং এইরূপ আরও বিভিন্ন রেওয়াতে রোযা রাখা অবস্থায় এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ আসিয়াছে এবং এই কাজগুলিকে যেন রোযা বিনষ্টকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আমাদের এই যুগে রোযা রাখিয়া আজে–বাজে কথাবার্তায় মশগুল হওয়াকে সময় কাটানোর উপায় মনে করা হয়। কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে মিথ্যা ও গীবত দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই দুইটি বিষয় এই সকল ওলামায়ে কেরামের নিকট খানাপিনা ইত্যাদি অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী জিনিসের মতই। আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও রোযা ভঙ্গ হয় না কিন্তু রোযার বরকত নষ্ট হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

মাশায়েখগণ রোযার ছয়টি আদব লিখিয়াছেন। রোযাদার ব্যক্তির জন্য এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

১নং. দৃষ্টির হেফাজত করা। যেন কোন অপাত্রে দৃষ্টিপাত না হয়। এমনকি স্ত্রীর প্রতিও যেন কামভাবের দৃষ্টি না পড়ে। সুতরাং বেগানা মহিলার তো প্রশ্নই উঠে না। এমনিভাবে কোন খেলাধুলা ইত্যাদি নাজায়েয কাজের দিকেও যেন দৃষ্টি না যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্য হইতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উহা হইতে বাঁচিয়া চলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন ঈমানী নূর দান করিবেন যাহার মিষ্টতা ও স্বাদ সে তাহার দিলের মধ্যে অনুভব করিবে। সূফীয়ায়ে কেরাম 'অপাত্রে দৃষ্টিপাত করা' এর ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন যে, এমন যে কোন জিনিসের

প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইহার অন্তর্ভুক্ত, যাহা অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা হইতে সরাইয়া দিয়া অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট করিয়া দেয়।

২নং জবানের হিফাজত করা। মিথ্যা, চুগলখোরী, বেহুদা কথাবার্তা, গীবত, অশ্লীল কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি সবকিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই রোযাদারের উচিত, সে যেন তাহার জবান দ্বারা কোন অশ্লীল বা মূর্খতার কথাবার্তা যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি না করে। যদি কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তবে বলিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার। অর্থাৎ যদি কেহ আগে বাড়িয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দেয় তবুও তাহার সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইবে না। যদি লোকটি বুদ্ধিমান হয় তবে তাহাকে বলিয়া দিবে যে, আমি রোযা রাখিয়াছি। আর যদি লোকটি বেওকুফ ও নির্বোধ হয় তবে নিজের অন্তরকে বুঝাইয়া দিবে যে, তুই রোযা রাখিয়াছিস ; তোর জন্য এই সকল বেহুদা কথাবার্তার জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া গীবত ও মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা অনেক ওলামায়ে কেরামের নিকট ইহা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় দুইজন মহিলা রোযা রাখিয়াছিল। রোযা অবস্থায় তাহাদের এমন তীব্র ক্ষুধা লাগিল যে, সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রাণ নাশ হইবার উপক্রম হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করিলে তিনি তাহাদের নিকট একটি পেয়ালা পাঠাইয়া দিলেন এবং দুইজনকেই উহাতে বমি করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ে বমি করিলে দেখা গেল যে, উহার সহিত গোশতের টুকরা এবং তাজা রক্ত বাহির হইয়াছে। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহারা আল্লাহর দেওয়া হালাল রুজির দ্বারা রোযা রাখিয়াছিল বটে ; কিন্তু পরে হারাম জিনিস ভক্ষণ করিয়াছে। অর্থাৎ দুই মহিলাই মানুষের গীবতে লিপ্ত ছিল। এই হাদীসের দ্বারা আরও একটি বিষয় জানা যায় যে, গীবত করার কারণে রোযার কষ্ট খুব বেশী অনুভব হয়। যেমন এই দুই মহিলা রোযার কারণে মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য গোনাহের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। অভিজ্ঞতার দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদাভীরু মুত্তাকী লোকদের উপর রোযার কষ্টের সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না। পক্ষান্তরে ফাসেক লোকদের প্রায়ই খারাপ অবস্থা হইতে দেখা যায়।

অতএব যদি কেহ চায় যে, রোযার কষ্ট তাহার অনুভব না হউক, তবে ইহার জন্য উত্তম পন্থা হইল যে, রোযা অবস্থায় যাবতীয় গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে ; বিশেষতঃ গীবতের গোনাহ হইতে, যাহাকে লোকেরা রোযা অবস্থায় সময় কাটাইবার একটি উপায় মনে করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হাদীস শরীফেও এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যেগুলি দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, যাহার গীবত করা হয় প্রকৃত পক্ষেই তাহার গোশত ভক্ষণ করা হয়। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুসংখ্যক লোককে দেখিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা দাঁতে খেলাল করিয়া লও। তাহারা আরজ করিল, আমরা তো আজ গোশত খাই নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের দাঁতে অমুক ব্যক্তির গোশত লাগিয়া রহিয়াছে। পরে জানা গেল যে, তাহারা ঐ ব্যক্তির গীবত করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। কেননা, এই বিষয়ে আমরা খুবই গাফেল ও উদাসীন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা ; খাছ লোকেরাই ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। যাহাদেরকে দুনিয়াদার বলা হয় তাহাদের কথা বাদ দিলেও যাহাদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের মজলিসও সাধারণতঃ গীবত হইতে খুব কমই মুক্ত থাকে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হইল, অধিকাংশ লোকই ইহাকে গীবত বলিয়াই মনে করে না। যদি নিজের অথবা কাহারো মনে একটু খট্‌কা লাগেও তখন উহাকে 'বাস্তব ঘটনা বলিতেছি' বলিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, গীবত কি জিনিস? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, গীবত হইল কাহারও পশ্চাতে এমন কথা বলা যাহা তাহার কাছে অপছন্দনীয়। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, যাহা বলা হইল যদি বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এই বিষয়টি থাকে তবে কি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তবেই তো ইহা গীবত হইবে। আর যদি বিষয়টি আসলেই তাহার মধ্যে না থাকে তবে তো উহা মিথ্যা অপবাদ। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় এরশাদ ফরমাইলেন, এই দুই কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হইতেছে। একজনকে এইজন্য যে, সে মানুষের গীবত করিত। অপরজন পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সূদের সত্তরটিরও বেশী স্তর রহিয়াছে।

এইগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন ও হালকা স্তরটি নিজের মায়ের সহিত জেনা করার সমতুল্য। আর সূদের একটি দেরহাম পঁয়ত্রিশবার জেনার চেয়েও অধিক মারাত্মক। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে ঘৃণ্যতম সূদ হইল মুসলমানের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করা। হাদীস শরীফে গীবত এবং মুসলমানের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করার উপর কঠোর হইতে কঠোর ধমকি আসিয়াছে। আমার দিল চাহিতেছিল যে, এইগুলি হইতে বেশকিছু পরিমাণ রেওয়ায়াত এখানে একত্রিত করিয়া দেই। কারণ, আমাদের মজলিসগুলি এই সকল বিষয়ের দ্বারা খুব বেশী ভরপুর থাকে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়ার কারণে এখানেই শেষ করিতেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই মুসীবত হইতে রক্ষা করুন। বিশেষ করিয়া বুযুর্গ মুরুব্বী ও দোস্ত-আহবাবদের দোয়ার বদৌলতে আমি গোনাহগারকেও হেফাজত করুন। কেননা আমি বাতেনী রোগ-ব্যাধিতে খুবই আক্রান্ত রহিয়াছি।

كبر ونخوت جہل وغفلت حقد وکینہ بدظنی　　کذب وبدعہدی ریا وبغض وغیبت دشمنی

کون بیماری ہے یارب جو نہیں مجھ میں ہوئی　　عَافِنِي مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاقْضِ عَنِّي حَاجَتِي

إِنَّ لِي قَلْبًا سَقِيمًا أَنْتَ شَافِ لِلْعَلِيلِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! অহংকার, আত্মগরিমা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা, মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী, রিয়াকারী, জিদ মিটানো, গীবত, দুশমনী এমন কোন্ রোগ আছে, যাহা আমার মধ্যে নাই। হে আল্লাহ! আমাকে সমস্ত রোগ-ব্যাধি হইতে আরোগ্য দান করুন, আমার হাজত-জরুরত পুরা করিয়া দিন। আমার অন্তর রোগাক্রান্ত ; আপনি উহাকে সুস্থ করিয়া দিন।

৩নং. জিনিস যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া রোযাদারের জন্য জরুরী উহা হইল, কানের হেফাজত। প্রত্যেক অপ্রিয় বিষয় যাহা মুখে বলা বা জবান হইতে বাহির করা নাজায়েয উহার প্রতি কর্ণপাত করাও নাজায়েয। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই গুনাহের মধ্যে অংশীদার হয়।

৪নং. জিনিস শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করা। যেমন হাতকে নাজায়েয বস্তু ধরা হইতে, পা কে নাজায়েয বস্তুর দিকে যাওয়া হইতে বিরত রাখা। অনুরূপভাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকেও বিরত রাখা। এমনিভাবে ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাবার হইতে হেফাজত করা। যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়া হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে,

তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত, যে কোন রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করে, কিন্তু উহার সাথে সামান্য বিষও মিশাইয়া লয়, ফলে তাহার সেই রোগের জন্য ঔষধটি উপকারী হইবে কিন্তু সাথে সাথে এই বিষ তাহাকে ধ্বংসও করিয়া দিবে।

৫নং. জিনিস ইফতারের সময় হালাল মাল হইতেও এত বেশী না খাওয়া, যাহার দ্বারা পেট পুরাপুরি ভরিয়া যায়। কেননা, ইহাতে রোযার উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। রোযার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কামপ্রবৃত্তি ও পশু শক্তিকে দুর্বল করা এবং নূরানী ও ফেরেশতাসুলভ শক্তিকে বৃদ্ধি করা। এগার মাস পর্যন্ত অনেক কিছু খাওয়া হইয়াছে ; এখন যদি একমাস কিছুটা কমাইয়া দেওয়া হয়,তাহা হইলে কি জান বাহির হইয়া যাইবে? কিন্তু আমাদের অবস্থা তো এই যে, ইফতারের সময় পিছনের কাজা সহ এবং সেহরীর সময় সামনের অগ্রিম সহ এতবেশী পরিমাণে খাইয়া লই যে, রমযান ছাড়া এবং রোযা না রাখা অবস্থায়ও এত পরিমাণ খাওয়ার সুযোগ আসে না ; রমযানুল মোবারক যেন আমাদের জন্য ভোজের উৎসব হইয়া যায়।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, মানুষ যদি ইফতারের সময় অধিক ভোজন করিয়া ক্ষতির পরিমাণ পোষাইয়া নেয়, তবে রোযার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নফসের খাহেশ ও শয়তানের শক্তি দমন করা কিভাবে হাসিল হইতে পারে! আসলে আমরা শুধু খানার সময় পরিবর্তন করিয়া দেই, ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই পরিবর্তন করি না। বরং খানার বিভিন্ন পদ আরও বাড়াইয়া লই, অন্য মাসে যাহা সহজে করা হয় না। মানুষের অভ্যাস কতকটা এমন হইয়া গিয়াছে যে, ভাল ভাল বস্তু রমযানের জন্য রাখিয়া দেয়। আর নফস সারাদিন ভুকা থাকার পর যখন এইগুলি সামনে পায় তখন খুব পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করে। ফলে কামপ্রবৃত্তি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরও উত্তেজিত হইয়া জোশে আসিয়া যায়। এইভাবে রোযার উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়া যায়। রোযার মধ্যে শরীয়ত যে সকল উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রাখিয়াছে উহা তখনই হাসিল হইতে পারে যখন কিছুটা ক্ষুধার্তও থাকা হইবে। বড় উপকার তো উহাই যাহা উপরে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কামভাব ও পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করা। আর ইহাও কিছু সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকার উপরই নির্ভর করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। তোমরা ক্ষুধার দ্বারা উহার চলাচল বন্ধ করিয়া দাও। নফস ক্ষুধার্ত থাকিলেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৃপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে নফস যখন

পরিতৃপ্ত হয় তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভুকা থাকে। রোযার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল গরীব দুঃখীদের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং তাহাদের অবস্থা অনুভব করা। এই উদ্দেশ্য তখনই হাসিল হইতে পারে যখন সেহরীর সময় দুধ জিলাপী দিয়া পেট এত বেশী না ভরে যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধাই না লাগে। গরীব-দুঃখীদের সহিত মিল ও সামঞ্জস্য তখনই হইবে যখন কিছু সময় ভুকা থাকিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাও ভোগ করিবে। এক ব্যক্তি বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি শীতে কাঁপিতেছেন। অথচ তাঁহার নিকট তখন শীতের কাপড় ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি কাপড় খুলিয়া রাখার সময়? তিনি বলিলেন, বহু গরীব মানুষ রহিয়াছে, তাহাদেরকে সাহায্য করিবার মত শক্তি আমার নাই। অন্তত এইটুকু সহানুভূতি তো প্রকাশ করিতে পারি যে, আমি তাহাদের মত একজন হইয়া যাই।

সূফী মাশায়েখগণ ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। ফকীহগণও এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 'মারাকিল ফালাহ' কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সেহরীতে এত বেশী খাইবে না যেমন ভোগবিলাসীরা খাইয়া থাকে। কেননা ইহা রোযার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। আল্লামা তাহতাবী (রহঃ) ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, এইখানে রোযার উদ্দেশ্য বলিতে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, যেন কিছুটা ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব হয় যাহাতে উহা অধিক সওয়াব লাভের কারণ হয় এবং গরীব-দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কোন পেট পূর্ণ করা আল্লাহর নিকট এত অপছন্দনীয় নয়, যত অপছন্দনীয় উদর পূর্ণ করা। এক জায়গায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষের জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট যাহা তাহার কোমর সোজা রাখিতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি খাইতেই চায় তবে তাহার জন্য ইহার চেয়ে বেশী যেন না হয় যে, পেটের তিনভাগের একভাগ খানার জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ পানির জন্য রাখিবে, আরেক ভাগ খালি রাখিবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখিতেন মাঝে কোন কিছুই আহার করিতেন না; ইহার কোন তাৎপর্য তো অবশ্যই থাকিবে।

আমি আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)কে দেখিয়াছি যে, পুরা রমযান মুবারকে তাহার ইফতার ও সেহরী এই দুই ওয়াক্তের খাওয়ার পরিমাণ আনুমানিক দেড়খানা চাপাতি রুটির

বেশী হইত না। কোন খাদেম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, ক্ষুধা হয় না; বন্ধুবান্ধবদের খাতিরে তাহাদের সহিত বসিয়া যাই। আর ইহার চাইতেও বড় ব্যাপার হইল হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরী (রহঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি যে, একাধারে তাঁহার কয়েকদিন এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, ইফতার ও সেহরীর জন্য সারারাত্রে খাবারের পরিমাণ দুধবিহীন কয়েক কাপ চা ব্যতীত আর কিছুই হইত না। একবার হযরতের নিষ্ঠাবান খাদেম হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব (রহঃ) বিনয়ের সহিত আরজ করিলেন, হযরত! আপনি তো কিছুই আহার করিতেছেন না, এইভাবে তো আপনি খুবই দুর্বল হইয়া যাইবেন। হযরত বলিলেন—'আল-হামদুলিল্লাহ, জান্নাতের স্বাদ হাসিল হইতেছে।' আল্লাহতায়ালা যদি আমাদের ন্যায় গোনাহগারদিগকেও এই সকল বুযুর্গদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন তবে তাহাও অনেক সৌভাগ্যের কথা। শেখ সাদী (রহঃ) বলেন—

ندانند تن پروران آگہی کہ پُر معدہ باشد ز حکمت تہی

অর্থ ঃ পেটপূজারীরা জানে না যে, ভরা পেট হেকমত ও প্রজ্ঞা হইতে খালি হইয়া থাকে।

৬নং যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা একজন রোযাদারের জন্য জরুরী তাহা এই যে, রোযা রাখার পর এই ভয়ে ভীত হওয়া যে, নাজানি এই রোযা কবূল হইতেছে কিনা। অনুরূপভাবে প্রত্যেক এবাদত শেষ করার পর এই ধারণা পোষণ করা চাই যে, যে সকল ভুলত্রুটির প্রতি সাধারণতঃ নজর যায় না নাজানি সেইরকম কিছু ঘটিয়া যাওয়ার কারণে এই এবাদত আমার মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয় কিনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'কুরআন তেলাওয়াতকারী অনেকেই এমন আছে যাহাদের উপর কুরআন লানত করিতে থাকে।' তিনি আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের ফয়সালা হইবে তাহাদের মধ্যে একজন শহীদও থাকিবে। তাহাকে ডাকা হইবে এবং দুনিয়াতে তাহাকে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল সেইগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে আর সে ঐ সমস্ত নেয়ামত স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত নেয়ামতের সে কি হক আদায় করিয়াছে। সে আরজ করিবে তোমার রাস্তায় জিহাদ করিয়াছি; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, বরং জিহাদ এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে

তোমাকে বাহাদুর বলিবে। আর তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর হুকুম হইবে ফলে তাহাকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অনুরূপভাবে একজন আলেমকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও ঠিক একইভাবে আল্লাহ তায়ালার সকল নেয়ামত স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সকল নেয়ামত লাভের বদলায় সে কি আমল করিয়াছে। সে আরজ করিবে, এলেম শিখিয়াছি এবং মানুষকে শিখাইয়াছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। বরং তুমি উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে বড় আলেম বলিবে। সুতরাং দুনিয়াতে উহা বলা হইয়াছে। তাহার ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। এমনিভাবে একজন ধনবানকে ডাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের দ্বারা সে কি আমল করিয়াছে। সে বলিবে, নেক কাজের কোন রাস্তা আমি ছাড়ি নাই যেখানে মাল খরচ করি নাই। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এবং তোমাকে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহার ব্যাপারেও হুকুম হইবে ফলে উপুড় করিয়া টানিয়া তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। এই সবকিছুই হইল এখলাস না থাকার পরিণতি।

এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। এইজন্য রোযাদার ব্যক্তির উচিত, নিজের নিয়তের হেফাজত করিবার সাথে সাথে কবুলিয়তের ব্যাপারে ভয়ও করিতে থাকিবে এবং দোয়াও করিতে থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার রোযাকে আপন সন্তুষ্টির কারণ বানাইয়া লন। কিন্তু সাথে সাথে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখিবে যে, নিজের আমলকে কবুল হওয়ার যোগ্য মনে না করা ভিন্ন জিনিস আবার দয়াময় মনিবের মেহেরবানীর উপর দৃষ্টি রাখা একটি ভিন্ন বিষয়। তাহার মেহেরবানী ও করুণার রীতি–নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ; তিনি কখনও গোনাহের উপরও সওয়াব দিয়া দেন, সেইক্ষেত্রে আমলের ত্রুটি–বিচ্যুতির কথা না বলিলেও চলে।

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست　　بسیار شیوہا است بتاں را کہ نام نیست

অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গী ও লাস্যময় চালচলনই কেবল তাহার সৌন্দর্য মাধুরী নহে, বরং প্রিয়ার আরো কত যে নাম না জানা মনমাতানো ভাবভঙ্গী রহিয়াছে!

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সাধারণ নেককারদের জন্য জরুরী। আর খাছ লোক ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গদের জন্য এইগুলির সাথে আরও একটি সপ্তম বিষয়কে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল, অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে দিবে না। এমনকি রোযা রাখা অবস্থায় এই খেয়ালও করিবে না যে, ইফতারের জন্য কোন কিছু আছে কিনা। কারণ, ইহাও দোষণীয় বলা হইয়াছে।

কোন কোন মাশায়েখ লিখিয়াছেন যে, রোযা অবস্থায় সন্ধ্যায় ইফতারের জন্য কোন জিনিস হাসিলের ইচ্ছা করাও দোষণীয়। কেননা ইহাতেও আল্লাহর রিযিক দেওয়ার ওয়াদার উপর ভরসা কম আছে বলিয়া বুঝা যায়। 'শরহে এহইয়া' গ্রন্থে কোন কোন মাশায়েখের ঘটনা লিখা হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট ইফতারের ওয়াক্তের পূর্বে কোথাও হইতে কিছু আসিয়া যাইত তবে তাহা অপর কাহাকেও এইজন্য দিয়া দিতেন যে, হয়ত অন্তর উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাওয়াক্কুলের মধ্যে কোন প্রকারের কমি হইয়া যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা হইল বড় মরতবার লোকদের জন্য। আমাদের মত লোকদের জন্য এইরূপ উঁচু বিষয়ের লোভ করাও অবান্তর। এই মর্তবায় পৌঁছিবার আগে এমন পন্থা অবলম্বন করার অর্থ হইল নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা।

মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন যে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে' আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম দ্বারা মানুষের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের উপরই রোযা ফরয করা হইয়াছে। সুতরাং জিহবার রোযা হইল মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কানের রোযা হইল যাবতীয় নাজায়েয কথা শ্রবণ করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। চোখের রোযা হইল সকল প্রকার নাজায়েয ও অহেতুক জিনিসের প্রতি নজর করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের জন্যও রোযা আছে। যেমন নফসের রোযা হইল, লোভ–লালসা ও জৈবিক চাহিদা হইতে বাঁচিয়া থাকা। দিলের রোযা হইল দুনিয়ার মহবত হইতে দিলকে খালি রাখা। আত্মার রোযা হইল আখেরাতের স্বাদ ও সুখ–শান্তির কামনা হইতেও বাঁচিয়া থাকা। আর সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাছ রোযা হইল গায়রুল্লার অস্তিত্বের কল্পনা হইতেও বাঁচিয়া থাকা।

(১০) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَفْطَرَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص (قصداً) بلا کسی شرعی عذر کے ایک

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ۔

دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کرے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

(رواہ احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجۃ والدارمی والبخاری فی ترجمۃ باب کذا فی المشکوٰۃ قلت وبسط الکلام علی طرقہ العینی فی شرح البخاری)

(১০) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতীত রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করিবে, সে রমযানের বাহিরে সারাজীবন রোযা রাখিলেও উহার বদলা হইবে না।

ফায়দা ঃ কোন কোন আলেম যাহাদের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীও রহিয়াছেন, এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের অভিমত হইল, যে ব্যক্তি বিনা কারণে রমযান মুবারকের কোন রোযা হারাইল আদায় করিল না, উহার কাযা কিছুতেই হইতে পারে না যদিও সে সারাজীবন রোযা রাখিতে থাকে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদি কেহ রমযানের রোযা না রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে এক রোযার পরিবর্তে এক রোযার দ্বারাই কাযা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি রোযা রাখার পর ভাঙ্গিয়া থাকে তবে একটি রোযার পরিবর্তে কাফ্ফারা হিসাবে একাধারে দুইমাস রোযা রাখিলে তাহার ফরয জিম্মা হইতে আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য রমযান মুবারকের বরকত ও ফযীলত লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। আর উপরোক্ত হাদীসের অর্থ ইহাই যে, রমযান শরীফে রোযা রাখিলে যে বরকত হইত, উহা সে আর কখনও হাসিল করিতে পারিবে না। এই অবস্থা তো শুধু তাহাদের জন্য যাহারা রোযা ভঙ্গ করার পর কাযা করিয়া নেয়। আর যাহারা আদৌ রোযা রাখেই না—যেমন বর্তমান যমানায় অনেক ফাসেকের অবস্থা এইরূপ রহিয়াছে ; ইহাদের গোমরাহীর কথা কী আর বলিবার আছে?

রোযা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর। সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ও রেসালাতকে স্বীকার করা। অতঃপর ইসলামের অন্যান্য চারটি প্রসিদ্ধ রুকন হইল নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। বহু

মুসলমান এমন আছে যাহারা আদমশুমারীতে মুসলমান হিসাবে গণ্য হইলেও ইসলামের এই পাঁচটি মূল ভিত্তির একটিও তাহাদের মধ্যে নাই। সরকারী কাগজপত্রে তাহাদেরকে মুসলমান লিখা হইলেও আল্লাহর তালিকায় তাহারা মুসলমানরূপে গণ্য হইতে পারে না। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলামের ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর—কালেমায়ে শাহাদত, নামায ও রোযা। যে ব্যক্তি এই তিনটি ভিত্তির মধ্যে একটিও ছাড়িয়া দিবে, সে কাফের। তাহাকে হত্যা করা হালাল ও বৈধ। ওলামায়ে কেরাম যদিও এই ধরনের রেওয়ায়াতের সাথে ফরযকে অস্বীকার করার শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন কিংবা অন্য কোন ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু ইহা বাস্তব যে, এই সমস্ত লোকের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হইতে কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কাজেই আল্লাহ তায়ালার ফরয আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা ও ত্রুটিকারীদের উচিত, তাহারা যেন আল্লাহর আজাব ও গজবকে খুব বেশী ভয় করে। কারণ, মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। দুনিয়ার সুখ-শান্তি,ভোগ-বিলাস তো অতি সত্বর খতম হইয়া যাইবে ; একমাত্র আল্লাহর এতায়াত ও আনুগত্যই কাজে আসিবে। অনেক জাহেল লোক আছে তাহারা রোযা না রাখার উপরই ক্ষান্ত থাকে ; কিন্তু অনেক বদদ্বীন এইরূপ রহিয়াছে যে, যাহারা মুখেও এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহা তাহাদেরকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। যেমন বলিয়া থাকে যে, রোযা তো তাহারাই রাখিবে যাহাদের ঘরে খাবার নাই। অথবা এইরূপ বলে যে, আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া আল্লাহর কী লাভ? ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথাবার্তা বলা হইতে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এবং গভীর মনোযোগ সহকারে একটি মাসআলা বুঝিয়া লওয়া চাই যে, দ্বীনের ছোট হইতে ছোট যে কোন বিষয় নিয়া উপহাস ও ঠাট্টা করা কুফরের কারণ হইয়া যায়। যদি কেহ সারা জীবন নামায না পড়ে, কখনও রোযা না রাখে, এমনকি অন্য কোন ফরযও আদায় না করে, কিন্তু এইগুলিকে অস্বীকার না করে, তবে সে কাফের হইবে না ; বরং ফরয আমল আদায় না করার জন্য তাহার গোনাহ হইবে। আর যে ফরযগুলি আদায় করিয়াছে সেইগুলির সওয়াব ও পুরস্কার পাইবে। কিন্তু দ্বীনের কোন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা কুফর। ফলে তাহার সমগ্র জীবনের অন্যান্য নামায রোযা ও নেক আমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখিবার বিষয়। অতএব রোযার ব্যাপারেও যেন এরূপ কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির

না হয় এবং উপহাস ও বিদ্রূপ করা না হয়। এতদসত্ত্বেও কোন কারণ ব্যতীত রোযা ভঙ্গকারী ফাসেক হইবে। ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত রমযান মাসে প্রকাশ্যভাবে খাওয়া দাওয়া করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে। ইসলামী হুকূমত ও আমীরুল মুমেনীন না থাকার কারণে যদিও কতলের বিধান নাই কিন্তু তাহার এই নাপাক কর্মকাণ্ডের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা সকলেরই দায়িত্ব। কেননা, অন্তরে ঘৃণাপোষণ করার নীচে ঈমানের আর কোন স্তর নাই। আল্লাহ তায়ালা তাহার নেক বান্দাদের তোফায়েলে আমাকেও নেক আমল করার তওফীক দান করুন। কারণ, আমিও অধিক ভুলত্রুটিকারীদের মধ্যে শামিল রহিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এই দশটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। কেননা যাহারা মানিয়া চলে তাহাদের জন্য একটি হাদীসই যথেষ্ট ; সেইক্ষেত্রে এখানে পরিপূর্ণ দশটি হাদীস আলোচনা করা হইল। আর যাহারা মানিয়া চলে না তাহাদের জন্য যতই লেখা হইবে সবই বেকার। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে আমল করার তওফীক দান করুন ; আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরের বয়ান

রমযান মাসের রাত্রগুলির মধ্য হইতে একটি রাত্রকে শবে কদর বলা হয়। যাহা খুবই বরকত ও কল্যাণের রাত্র। কালামে পাকের মধ্যে উহাকে হাজার মাস হইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। হাজার মাসে তিরাশি বৎসর চার মাস হয়। অত্যন্ত ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাহার এই রাত্রে এবাদত করার তওফীক হইয়া যায়। কারণ, যে ব্যক্তি এই রাত্রটি এবাদতের মধ্যে কাটাইয়া দিল সে যেন তিরাশি বছর চার মাসের বেশী সময় এবাদতে কাটাইয়া দিল। আর এই বেশীরও পরিমাণ আমাদের জানা নাই যে, ইহা হাজার মাসের চাইতেও কত মাস বেশী উত্তম। যাহারা এই মোবারক রাত্রের কদর বুঝিয়াছে তাহাদের জন্য বাস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি বড় মেহেরবানী যে, তিনি দয়া করিয়া এমন একটি অপরিসীম নেয়ামত দান করিয়াছেন। 'দুররে মানসূর' কিতাবে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা শবে কদর আমার উম্মতকেই দান করিয়াছেন ; পূর্ববর্তী উম্মতগণ উহা পায় নাই। কি কারণে এই নেয়ামত দেওয়া হইয়াছে এই ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোন

কোন হাদীসে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ দুনিয়াতে দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতেন আর সেই তুলনায় এই উম্মতের হায়াত খুবই কম, এমতাবস্থায় কেহ যদি তাহাদের সমান নেক আমল করিতেও চায় তথাপি উহা সম্ভব নয়। বিষয়টি চিন্তা করিয়া আল্লাহর পেয়ারা নবীর খুবই কষ্ট হইল। বস্তুতঃ এই ক্ষতিপূরণের জন্যই এই রাত্রি দান করা হইয়াছে। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি দশটি শবে কদরও পাইয়া যায় আর সে এইগুলিকে এবাদত-বন্দেগীতে কাটাইয়া দেয় তবে সে যেন আটশত তেত্রিশ বছর চার মাসেরও অধিক সময় পুরাপুরিভাবে এবাদতে কাটাইয়া দিল। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি একহাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরামের মনে ঈর্ষা হইল। অতঃপর তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রটি দান করিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈল গোত্রের চারজন নবী—হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত যাকারিয়্যা (আঃ), হযরত হিযকীল (আঃ) ও হযরত ইউশা (আঃ)এর আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আশি বৎসর করিয়া এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং চোখের এক পলক পরিমাণ সময়ও আল্লাহর নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) সূরায়ে কদর লইয়া হুযূরের খেদমতে হাজির হইলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এইসব রেওয়ায়াতে বিভিন্নতার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে, একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিবার পর যখন কোন আয়াত নাযিল হয় তখন প্রত্যেক ঘটনাকেই উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বলা যাইতে পারে। এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ যাহাই হউক না কেন, এই রাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে উম্মতে মুহম্মদীর প্রতি এক বিরাট দান ও বিরাট রহমত। আর এই রাত্রে এবাদত-বন্দেগীর সুযোগও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার তওফীকেই হইয়া থাকে।

تہیدستانِ قسمت راچہ سُود از راہبر کامل
کہ خضر از آبِ حیواں تشنہ می آرد سکندر را

অর্থাৎ, কিসমত যাহাদের শূন্য, তাহাদের জন্য যোগ্য পথপ্রদর্শক